আ গা থা ক্রি স্টি

এণ্ডলেস নাইট

অনুবাদ : মাসুদ রানা

banglabooksz.blogspot.com

এণ্ডলেস নাইট

আমাদের জীবনে কোন ঘটনা যে কি পরিণতি নিয়ে আসবে তা কি আগে থেকে কেউ বলতে পারে, না বুঝতে পারে!

কখন দুর্দৈব নেমে আসবে কিংবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে এর কোনটাই আমাদের জানার সীমানায় থাকে না। আমারও হয়েছে তাই।

এই ঘটনাটাকে দুটো পর্বে ভাগ করা চলে। এবং বলতে হলে যে কোন দিক থেকেই শুরু করা যায়। তবে আমি জিপসি একর থেকেই শুরু করব।

হ্যাঁ, জিপসি একর।

সেদিন হাতে বিশেষ কাজ ছিল না। কিংসটন বিশপের প্রধান সড়ক ধরে খেয়াল খুশিমত হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। এদিকটায় সচরাচর আসা হয় না। আজ কি মনে হতে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলাম।

হঠাৎ জর্জ অ্যাণ্ড ড্রাগনের দেয়ালের নোটিশ বোর্ডে চোখ পড়ল। টাওয়ার নামে একটা পুরনো বনেদী বাগানবাড়ি নিলামে বিক্রির কথা লেখা রয়েছে তাতে।

টাওয়ারের বিশদ বিবরণও দেওয়া হয়েছে।

বেশ কয়েক একর জায়গা জুড়ে বাগান বাড়ি। প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোরম। প্রায় একশ বছরের পুরনো বাড়ি।

বিবরণ পড়ে বুঝতে পারলাম, একদিন যে বাড়ি লোকজনের সমাবেশে গমগম করত, এখন সেই গৌরবময় অতীত স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে একটা ধ্বংসস্তূপ।

এই যে আচমকাই ঘটনাটা ঘটল, অর্থাৎ টাওয়ার বিক্রির নোটিশটা আমার চোখে পড়ল এটা কোন দুর্দৈব না ভাগ্যের প্রসন্নতা, সেই মুহূর্তে বুঝতে না পারলেও এখন বুঝতে পারছি, দুদিক থেকেই ব্যাপারটাকে অনায়াসে নেওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ স্থপতি স্যানটনিক্সের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়ের প্রসঙ্গটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কেননা ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়ের দিন থেকেই এই কাহিনীর সূত্রপাত এমন মনে করলেও অযৌক্তিক হবে না।

স্যানটনিক্সের শীর্ণ, পাণ্ডুর গাল, অত্যুজ্জ্বল চোখ এই চেহারাটা চোখ বুজলে এখনো পরিষ্কার দেখতে পাই।

দক্ষ হাতে তিনি কাগজের ওপরে নানান ছাঁদের বাড়ির নক্সা আঁকেন, আর সেসব বাড়ি বাস্তবে রূপদান করেন—তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার মধ্যে বিশেষ একটা বাড়ি আবার এমনই সুন্দর যে দেখলে মনে হয়, এরকম একটা স্বপ্নময় বাড়ির মালিক না হতে পারলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই নিরর্থক।

মনের মত একটা বাড়ির মালিক হব এই সাধ আমার আবাল্যের। তাই আশা করতাম, আমার সেই স্বপ্নের সৌধ একদিন স্যানটনিক্সই বানাবেন আর ততদিন অবশ্যই বেঁচে থাকবেন।

নিলামের নোটিশ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে যখন বাইরে তাকালাম মনে হল আমার চোখের সামনে যেন স্বপ্নরাজ্যের সেই অসম্ভব সুন্দর বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি।

সুপ্ত বাসনার কি মৃত্যু হয় না? তা না হলে যা অবিশ্বাস্য অসম্ভব কল্পনা তা বারে বারে ঘুরে আসে কেন? বুকের ভেতরে তার শেকড় কি এতই গভীর?

রাস্তার মোড়ে একটা লোক বিশাল একটা কাঁচি দিয়ে পথের ধারের ঝোপঝাড় কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করছিল। সম্ভবতঃ স্থানীয় পৌরসভারই নিম্নপদস্থ কর্মচারী।

পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ভাই টাওয়ার নামের বাগান বাড়িটা এদিকে কোথায় বলতে পার?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকটার মুখের চেহারা মুহূর্তে কেমন বদলে গেল। তার মুখের সেই

banglabooksz.blogspot.com

ছবি আজও আমি ভুলতে পারিনি।

আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। কি ভাবল। পরে বলল, ওই নামে আজকাল আর কেউ ডাকে না। পুরনো দু চারজন মনে রেখেছে। অনেক বছর আগে যারা ওখানে বাস করত তারাই বাড়িটার টাওয়ার নাম রেখেছিল।

—তাহলে জায়গাটার এখন কি নাম হয়েছে? জানতে চাইলাম আমি।

প্রৌঢ় লোকটার চোখ মুখ কেমন থমথমে হয়ে উঠল লক্ষ্য করলাম। সে যেন যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই বলল, এখন সকলে বলে জিপসি একর।

—ভারী অদ্ভুত নাম তো? এরকম নামকরণ হল কেন?

—আমি অবশ্য সঠিক বলতে পারব না। নানান জনের কাছে এ নিয়ে নানান কাহিনী শোনা যায়। সেগুলো বড় অদ্ভুত।

—কি রকম বল তো ভাই। আমি কৌতূহল প্রকাশ করি। লোকটা যেন ক্রমশই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠছিল।

—রকম কিছুই না, ওই জায়গাটাতেই বেছে বেছে দুর্ঘটনাগুলো বেশি ঘটে।

—মোটর অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

—কেবল মোটর অ্যাকসিডেন্ট হলে তবু রক্ষা হত, অনেক রকমের অ্যাকসিডেন্টই ঘটে। তবে মোটর অ্যাকসিডেন্টের সংখ্যাই বেশি।

—কারণটা কি?

—একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন, রাস্তাটা ওখানে বিশ্রী বাঁক নিয়েছে। বিপজ্জনক ওই পাহাড়ী বাঁকে অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো কি?

আমি বাঁদিকে তাকালাম।

এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি লোকটা।

পাহাড়ী রাস্তাটা আচমকা বাঁক নিয়েছে এমন ভাবে যে একটু অসাবধান হলেই দুর্ঘটনার মুখে পড়া স্বাভাবিক।

চোখে পড়ল, বাঁকটার আগেই স্থানীয় পৌরসভার নোটিশ বোর্ড। বেশ বড় বড় করে বিপজ্জনক কথাটা লেখা রয়েছে।

লোকটি বলল, ওই বোর্ড কোন কাজ দেয় না। দুর্ঘটনা যে এর জন্য কমেছে তা নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিপসি কথাটা ওর মধ্যে এলো কেন?

লোকটার ভ্রুজোড়া কুঁচকে উঠল। থেমে থেমে বলল, লোকের মুখে অনেক কথাই শোনা যায়। অনেক বছর আগে নাকি জিপসিরা ওখানে বাস করত। তাদের সেখান থেকে হটিয়ে ওই টাওয়ার বানানো হয়েছিল।

লোকটা একটু থামল। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

—চলে যাবার আগে জিপসিদের বুড়ো সর্দার নাকি ভীষণ অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল।

লোকটার মুখে ওরকম একটা গ্রাম্য কথা শুনে আমি হেসে না উঠে পারলাম না।

লোকটা আমার হাসি দেখে রেগে গেল। রুক্ষস্বরে বলল, তোমাদের শহরে লেখাপড়া শেখা ছেলেদের ওটাই দোষ। দুনিয়ার কোন খবরই রাখ না। তাই সব বিষয় নিয়েই হাসিমস্করা কর।

আমি লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। চোখ দুটো কেমন চকচক করছে। বলল, বিধাতার এই সংসারে এমন কিছু জায়গা আছে যেগুলো অভিশপ্ত। ওই জিপসি একরও তার মধ্যে একটা।

বাড়িটা তৈরির সময় সবাই জানে, খাদ থেকে পাথর বয়ে আনার সময় অনেক শ্রমিক মারা গিয়েছিল।

একটু থেমে আমার মুখে একপলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ফের বলল, এই গ্রামের বুড়ো জর্জ, তাকেও একরাতে ওখানে ঘাড় মটকে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

—তাতে কি, নিশ্চয় মাতাল হয়ে পথ চলেছিল।

—বুড়ো মদ খেত ঠিকই তবে তেমন বেশি কিছু না। কিন্তু অনেকেই তো মদ খেয়ে ওই

পথে চলাচল করে। তাদের কেউ তো জর্জের মত ঘাড় মটকে পড়ে থাকে না।

পাইন গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড়ের কোলে জিপসি একর সেই দিনই আমাকে যেন কোন অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলল। সেই মুহূর্তে আমি কি ভাবতে পেরেছিলাম যে এখান থেকেই আমার কাহিনীর সূত্রপাত হবে?

শুরু থেকে সমস্ত ঘটনা আমার স্মৃতিতে হুবহু আঁকা হয়ে আছে।

অনাবশ্যক কৌতূহল বশেই লোকটাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা সেই জিপসিরা তারপর কোথায় গেল?

—কোথায় গেল কেউ জানে না। আজকাল তাদের কাউকেই আর এ তল্লাটে দেখা যায় না। পুলিসও সতর্ক নজর রেখেছে।

আমি বললাম, অনেককেই দেখি জিপসিদের নাম শুনতে পারে না। তাদের ঘৃণা করে, না ভয় করে বুঝতে পারি না।

—ওরা হল ছিঁচকে চোরের দল।

বলতে বলতেই আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, তোমার মধ্যেও তো দেখছি খানিকটা জিপসি রক্ত রয়েছে, তাই না?

চট করেই লোকটার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। আমি ভাল করেই জানি জিপসিদের সঙ্গে আমার চেহারার কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু লোকটাকে সেকথা আমি সেই মুহূর্তে বলতে পারলাম না।

দু চোখে কৌতুকের ঝিলিক নিয়ে আমি লোকটার দিকে তাকালাম। তার চোখের দৃষ্টি দেখেই কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, সত্যি সত্যিই হয়তো আমার শরীরে জিপসি রক্ত মিশে আছে।

লোকটার কাছ থেকে সরে এসে আমি পাহাড়ী পথটা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে, পথের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের চূড়াতে জিপসি একর। ওদিকটা বেশ সমতল।

হাঁটতে হাঁটতে চূড়ায় উঠে চোখে পড়ল দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি। নজরে পড়ল বহুদূর দিয়ে স্টীমার যাতায়াত করছে।

দৃশ্যটা মনোরম সন্দেহ নেই। পাহাড়ে বসে সমুদ্র দেখা, ভাবতেই বুকের ভেতরে পুলক নৃত্য করে ওঠে। কেন জানি না, হাস্যকর ভাবেই মনে হল, আহা, জিপসি একর যদি আমার হত।

পাহাড়ের ওপরে বেশিক্ষণ থাকিনি। ফেরার পথে সেই প্রৌঢ় লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এখনো সে ঝোপঝাড়ে কাঁচি চালিয়ে চলেছে।

আরো কিছু কথাবার্তা হল তার সঙ্গে। আমার কথায় সে কি বুঝল কে জানে, বলল, এখানে যদি কোন জিপসির সঙ্গে কথা বলতে চাও তাহলে একজনের কথা বলতে পারি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে সে?

—মিসেস লী নামে এক জিপসি বুড়ি আছে। মেজরই তাকে এখানে এনে বসবাস করিয়েছে।

—এই মেজরটি আবার কে?

লোকটার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হল। অদ্ভুত স্বরে বলল, তুমি মেজর ফিলপটের কথা শোননি?

—না, ভাই সেই সৌভাগ্য হয়নি। কে এই ফিলপট বলতো?

তার কাছ থেকে যা শোনা গেল তাতে বুঝলাম, এই অঞ্চলের লোকের কাছে মেজর ভদ্রলোক দেবদূতের মতই শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র। তারা এখানকার বনেদী পরিবার। লীকে মেজরই সাহায্য দিয়ে রেখেছেন।

আমি আর বিশেষ কৌতূহল দেখালাম না কোন বিষয়েই। যখন চলে আসছি, লোকটা

banglabooksz.blogspot.com

যেন আপন মনেই বলে উঠল, একেবারে শেষ মাথার কুঁড়েটাতেই বুড়ি লী থাকে। কিন্তু ঘরে থাকে না একমুহূর্তের জন্য। আশপাশেই ঘুরঘুর করে বেড়ায়। জিপসি বলেই হয়তো ঘরে থাকতে চায় না।

শিস দিতে দিতে আমি পাহাড়ী পথ ধরে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। জিপসিদের কথাটাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কখন যে মিসেস লীর কুঁড়ের কাছাকাছি চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি।

একমাথা রুক্ষ তামাটে চুলের বুড়ি তার উঠোনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সামনাসামনি চলে এসেই আমার খেয়াল হল।

কোমর ছাপানো চুলের রাশি বাতাসে উড়ছে। একপলকেই চিনতে পারলাম এই হল জিপসি বুড়ি লী।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছেই তো আসছিলাম। শুনলাম, বহুদিন ধরে এই অঞ্চলে রয়েছ ?

রোমশ পাকা ভ্রূজোড়ার ফাঁক দিয়ে বুড়ি আমাকে বড় বড় চোখ করে দেখল। তারপর খসখসে গলায় বলল, তোমাকে দেখতে শুনতে তো ভালই লাগছে, কিন্তু এটা জান না, সব ব্যাপার নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়। তোমাকে এখানে কে টেনে এনেছে ? যদি ভাল চাও তো জিপসি একরের কথা মন থেকে মুছে ফেল। এখানে অভিশাপ আছে, কারুর কোন দিন মঙ্গল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

—নোটিশ দেখলাম, জায়গাটা নিলামে বিক্রি হবে।

—তাই বুঝি। তা হোক, কিন্তু সম্পত্তিটা যে কিনবে তার সর্বনাশ হবে নির্ঘাৎ।

—এতবড় জমি কারা কিনবে কিছু শুনেছ ?

—জমিটা কেনার কথা মাত্র জনাকয়েকের মাথাতেই ঘুরছে। দাম তো বেশি উঠবে না, সবাই জানে অভিশপ্ত জমি। খুব কমদামেই তাই বিক্রি হয়ে যাবে।

—সস্তায় পেলে কোন একজন ধনী ব্যক্তিই হয়তো কিনে নেবে। কিন্তু এখানে এসে কি করবে ?

কথাটা শুনে বুড়ি কেমন খলখল শব্দে হেসে উঠল। অজানা আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠল।

বুড়ি বলল, কেন পুরনো প্রাসাদ ভেঙ্গে নতুন সব ফ্ল্যাটবাড়ি বানাবে। তারপর সেগুলো হয় ভাড়া দেবে নয় তো বিক্রি করবে।

বলতে বলতে বুড়ি আবার সেই মারাত্মক হাসি হেসে উঠল। হাসি থামলে কেমন তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অভিশপ্ত মাটিতে সবকটা বাড়িই হবে অভিশপ্ত। সুখে বাস করা কারোর ভাগ্যে হবে না।

বুড়ির প্রথম কথাটাই কানে লেগেছিল। তাই বললাম, অতীতের এমন একটা বনেদী বাড়ি ভেঙ্গে ফেলাটা কোন ভাল কাজ নয়।

—শোনহে ছোকরা, এ জমি কিনে ক্ষতি ছাড়া কারুর লাভ হবে না। এখানে কাজ করবার জন্য যেসব শ্রমিক মজুর আসবে, তাদের অনেকেই দুর্ঘটনায় মারা পড়বে। তারপর থেকে নানান রকমের দুর্ঘটনা লেগেই থাকবে।

আমি লক্ষ করছিলাম, বুড়ি কেমন জোরের সঙ্গেই কথাগুলো বলছে। কেমন দুর্বোধ্য ঠেকছিল আমার।

বুড়ি নিজের মনেই বলে চলল, এটা হল জিপসি একর—পুরো তল্লাট অভিশপ্ত। এখানে কারুর কখনো ভাল হতে পারে না।

শেষ কথাগুলো বুড়ি এমন ভাবে বলল যে আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম।

—না বাছা, বুড়ির সারামুখে এখন রাগ গমগম করছে, অমন দাঁত দেখিয়ে হেসো না।

আমি দেখতে পাচ্ছি, ওই হাসি একদিন চোখ ভরা কান্না হয়ে ঝরবে।

এখনো বলছি, আখেরে ভাল চাও তো এই অঞ্চলের বিষ নিঃশ্বাস গায়ে লাগবার আগে পালিয়ে যাও।

—কিন্তু, তুমি তো জানবে নিশ্চয়ই, অমন বাড়িটার এই ভগ্নদশা হল কেন? বর্তমান মালিক কোথায় থাকে?

—বর্তমান মালিক? অতশত বলতে পারব না। কিন্তু শুনে রাখ যারা এখানে বাস করবে বলে এসেছিল তারা আর একজনও বেঁচে নেই। ভূত হয়ে গেছে।

—তারা মারা গেছে কিভাবে?

রহস্যময় হাসি হেসে বুড়ি লী বলল, সে সব পুরনো কথা আর বলতে চাই না। শুধু এটুকু শুনে রাখ, তারপর আর কেউ এখানে থাকতে আসেনি। অতবড় বাড়ি খালি পড়ে থেকে এখন একটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে। মালিকরা আর এই বাড়ির কথা মনে করতে চায় না। অবশ্য সেটাই মঙ্গল।

—কিন্তু পুরনো সেই ইতিবৃত্ত তুমি আমাকে বলতে পারতে। সবইতো জান তুমি।

—না বাছা জানলেও ওসব নিয়ে কারো কাছে গল্প করি না।

বলে বুড়ি হঠাৎই থেমে গেল। আমার দিকে দু পা এগিয়ে এল। আমার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিনতিভরা গলায় বলল, তবে, তুমি যদি জানতে চাও, তোমার ভাগ্য আমি বলে দিতে পারব। তার জন্য আমাকে একটা রুপোর মুদ্রা দিলেই হবে, বেশি দিতে হবে না।

বুড়ির আগেকার কণ্ঠস্বর যেন সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

গলার খসখসে ভাবটা অদ্ভুত রকমের মোলায়েম করে সে বলতে লাগল, তোমার হাতের রেখা দেখেই ভবিষ্যতের ভালমন্দ সবকথা আমি বলে দিতে পারব। তোমার সুন্দর কপাল দেখেই বুঝতে পারছি ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি করবে তুমি।

আমি হেসে বললাম, তোমাদের জিপসিদের ওসব বুজরুকি আমি একদম বিশ্বাস করি না। তাছাড়া দানখয়রাত করার মত মুদ্রাটুদ্রাও আমার কাছে নেই।

—বেশ তো, আধ শিলিংই না হয় দিও। তুমি ভাগ্যবান যুবক, এ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

অগত্যা একটা ছ পেনীর মুদ্রা বুড়ির হাতে দিতে হল। ওর চোখের লোলুপ দৃষ্টি কেমন ঝকঝক করে উঠল। ফোকলা দাঁতে অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে বলল, তোমার দু হাতের মুঠো আমার সামনে মেলে ধর।

আমি হাত মেলে ধরলাম। বুড়ি তার শীর্ণ থাবার মধ্যে টেনে নিয়ে রেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে কি দেখল। তারপর আচমকা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। নিজেও দু পা পিছিয়ে গেল। তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি অসম্ভব ধারালো হয়ে উঠল।

চিলের মত কর্কশ কণ্ঠে সে বলে উঠল, পালাও, পালিয়ে যাও এখান থেকে। যদি নিজের মঙ্গল চাও তো কোনদিন আর জিপসি একরে পা দিও না। নাম পর্যন্ত মুখে আনবে না।

—কেন, ওকথা বলছ কেন?

—এখানে তোমার জন্য কেবল চরম দুঃখকষ্টই অপেক্ষা করে আছে। একদম খাঁটি কথা বলছি, মারাত্মক কোন বিপদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

এখান থেকে আমাকে তাড়াবার ব্যস্ততা দেখে হেসে ফেললাম। বললাম, এত লোক থাকতে শেষে আমার জন্যই বেছে বেছে বিপদগুলি সব...

বুড়ি আমাকে কথা শেষ করতে দিল না। দ্রুত পায়ে তার ঝুপড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

বুড়ির ভাবসাব দেখে মনে হল যেন আমাকে এখান থেকে সে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

হয়তো দক্ষিণাটা মনমতো হয়নি বলেই এমন ব্যবহার।

হাত দেখা, ভবিষ্যৎ গণনা—এসবে কোন কালেই আমার বিশ্বাস নেই। তবে জীবনের পথে নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে চলে ভাগ্যকে অবিশ্বাস করি না।

ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গেছে। চারপাশে রহস্যময় অন্ধকার নেমে আসছে। হাওয়ার বেগও সুবিধার মনে হল না। গাছপালা দুলতে শুরু করেছে প্রবল ভাবে। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দ্রুত পায়ে নিচে থেমে এলাম। টাওয়ার বিক্রির নোটিশ বোর্ডটা চোখে পড়ল আবার। নিলামের দিনক্ষণ দেখে নিলাম ভাল করে।

এর আগে কোন রকম নিলামের ব্যাপারে আমি উপস্থিত থাকিনি। সে কারণে কোন কৌতূহলও ছিল না।

কিন্তু কি জানি কেন, মনে হল, টাওয়ার নিলামের দিনে উপস্থিত থাকব। অন্ততঃ যারা সম্পত্তিটা কেনার জন্য নিলাম ডাকবে, তাদের তো চেনার সুযোগ পাওয়া যাবে।

।। দুই ।।

যোগাযোগটা দৈবাৎই হল বলা চলে। যেদিন টাওয়ার নিলাম হবে, একটা কাজের যোগাযোগে সেদিনই আমাকে জিপসি একরের কাছাকাছি আসতে হল।

এক প্রৌঢ় দম্পতি লণ্ডন থেকে গাড়িভাড়া করেছিলেন। আমি ছিলাম সেই গাড়ির চালক।

আমার বহু বিচিত্র জীবন কাহিনীর সেটা ছিল এক পর্ব।

বাইশ বছরের জীবনে যেটুকু পথ পাড়ি দিয়েছি তাতে অনেক বিষয়েই প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

এই সুযোগ অবশ্য করে দিয়েছে আমার অন্তর-প্রকৃতি। কোন কাজেই আমি সুস্থির হতে পারতাম না। তাই দিনের পর দিন একটার পর একটা কাজ পাল্টেছি। আর সে কাজও হরেক রকমের।

কি করিনি আমি—আয়ারল্যাণ্ডে কিছুদিন এক ঘোড়ার আস্তাবলে কাজ করেছিলাম। আবার মাদকদ্রব্য পাচারকারী একটি দলের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলাম। তবে ভাগ্য ভাল, সর্বনাশের পথে বেশিদূর এগুবার আগেই সরে আসতে পেরেছিলাম।

এছাড়া, ফলের বাগানে কাজ করেছি, হোটেলের ওয়েটার হিসেবে ছিলাম, সমুদ্র-সৈকতে লাইফ-গার্ডের কাজও করতে হয়েছে কিছুদিন।

অনেক ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করেছি।

আবার একটা সময় দোরে দোরে ঘুরে বিশ্বকোষ বিক্রি করেছি। বোটানিক্যাল গার্ডেনে গাছপালার তদারকের কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলাম।

এমনি নানা ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছি।

কাজ পাল্টানো যেন একটা নেশার মত হয়ে গেছে আমার। যত পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজই হোক আমার তাতে আলস্য ছিল না।

আসলে দুনিয়াটাকে দেখতে বুঝতে, জানতে আমার খুব আনন্দ। সববিষয়েই আমার দুরন্ত কৌতূহল। তাই সারাক্ষণই কেবল ছুটে বেড়াচ্ছি।

বর্তমানে আমি গাড়ির চালক। গাড়ির কলকব্জা, কোন কিছুই আমার অপরিচিত নয়। ভাল মেকানিক হিসেবে পরিচিতও হয়েছি।

এছাড়া চালক হিসেবেও আমি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।

বর্তমানে অনেকগুলো মূল্যবান বিলাসবহুল গাড়ির আমি চালক। ওকাজে বিশেষ পরিশ্রম নেই বটে, তবে বড্ড একঘেয়ে।

একটা অশান্ত বিক্ষুব্ধ মন আমাকে সেই ছেলেবেলা থেকেই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। স্কুলের

গণ্ডি পেরুবার পর থেকেই আমার জীবন এই কর্মস্রোতে ভেসে চলেছে।

মাঝে মাঝে রেসের মাঠে ঢুঁ মারার অভ্যাসও তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। একটা অনামী ঘোড়ার পেছনে কপাল ঠুকে যাবতীয় সম্বল লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সেই ঘোড়াই বাজি জিতে গেল আর এই সুবাদে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ আমার পকেটে এসে গেছে। এখন আমি একজন ধনী ব্যক্তি।

জিপসি একবের কথা আমি ভুলতে পারছি না। সারাক্ষণই যেন কানের কাছে গুঞ্জন করে চলেছে।

ঠিক এরকমটা হয়েছিল স্যানটনিক্সের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনও।

স্যানটনিক্স পেশায় একজন স্থপতি। তার সঙ্গে পরিচিত হবার মত কোন সূত্র আমার ছিল না। বস্তুতঃ স্থপতিদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন প্রয়োজনও আমার ছিল না।

সেই সময় আমি এক আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট কোম্পানিতে সোফারের কাজে নিযুক্ত। দেশ-বিদেশের পয়সাওয়ালা যাত্রীদের নিয়ে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে হয়।

কর্মসূত্রেই আমাকে জার্মানী ও ফ্রান্সে কয়েকবার যেতে হয়েছে। দুই দেশের ভাষাও মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছিলাম।

পয়সাওয়ালা লোকদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে এরা কেউই সুখী মানুষ নয়।

শারীরিক আর মানসিক রোগে সারাক্ষণই ব্যতিব্যস্ত, বিধ্বস্ত। গরীব মানুষদের নিয়ে তারা কখনো মাথা ঘামায় না।

অথচ অর্থবিত্তের অধিকারী না হয়েও জীবনটা ছিল আমার ভারী মজার, আনন্দময়। শরীর স্বাস্থ্যও বরাবরই ভাল। কোন উৎপাত নেই কোনদিকে।

যৌবনের সেই দিনগুলোতে একটা স্বপ্নেই বিভোর হয়ে আছি, কোন দিন অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভ করব।

একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে বিভারিয়া যেতে হয়েছিল। প্রচুর টাকা খরচ করে ভদ্রলোক সেখানে একটা বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন। সেই বাড়ির স্থপতি ছিলেন মিঃ স্যানটনিক্স। কাজটা হচ্ছিলও তাঁরই তত্ত্বাবধানে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন কাজটা কতদূর এগোলো দেখার জন্য।

মিঃ স্যানটনিক্সকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি কোন দেশের মানুষ। আমার ধারণা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। তবে খুবই যে অসুস্থ তা একপলক দেখেই বোঝা যায়। অবশ্য বয়স বেশি নয়।

অতিশয় ক্ষীণ আর দুর্বল। কিন্তু কথাবার্তায় তাঁর মানসিক দৃঢ়তা আর কাজের অফুরন্ত বিশ্বাস ফুটে বেরয় প্রতিক্ষণে।

এই সুযোগেই আমার আলাপ হয়েছিল মিঃ স্যানটনিক্সের সঙ্গে। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, আমি সকলের বাড়ি তৈরি করি না। আমাকে দিয়ে বাড়ি তৈরি করাতে হলে অগাধ বিত্ত সম্পদের মালিক হতে হয়। সে কারণে আমি আমার পছন্দমত মক্কেল বেছে নিই।

প্রথম আলাপের পর বিভারিয়াতেই আমাদের পরেও বার কয়েক দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি যে প্রাসাদপুরী তৈরি করেছিলেন, সৌন্দর্যে ও বৈশিষ্ট্যে এককথায় তা ছিল অপূর্ব। সেই সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করবার মত শব্দ আমার জানা নেই।

প্রাসাদের মালিকও গোড়ার দিকে খরচের জন্য কিছুটা খুঁতখুঁত করলেও বাড়িটা দেখার পর গর্বিত হয়েছিলেন।

সেই প্রাসাদপুরী দেখে আমার মনের সুপ্ত বাসনাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, এমন বাড়িতেই বাস করে সুখ। দশজনকে ডেকে দেখানোর মত।

একদিন হঠাৎ মিঃ স্যানটনিক্স আমাকে বললেন, তোমার জন্যও একটা বাড়ি আমি তৈরি করে দিতে পারি। তুমি কি চাও আমি জানি। কিন্তু এটাই দুর্ভাগ্য যে তুমি ধনীব্যক্তি নও।

তারপর মৃদু হেসে বললেন, তোমার মনের মত বাড়ি তৈরি করাবার মত ধনীও তুমি কোনদিন হতে পারবে না।

আমি মৃদু আপত্তি প্রকাশ করে বলেছিলাম, এমন কথা কি কখনো বলা যায়? গরীব হয়ে জন্মালেই যে গরীব হয়েই থাকতে হবে এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম তো নেই। কার ভাগ্য কখন প্রসন্ন হবে, সেকথা কে বলতে পারে।

স্যানটনিক্র বলেছিলেন, তুমি পারতে পার, কেননা, আমি তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ তোমার ভেতরে সুপ্ত আছে।

যেদিন সেটা প্রবলভাবে জেগে উঠবে তুমিও অগাধ বিত্তের অধিকারী হতে পারবে।

আমি হেসে বলেছিলাম, তাহলে কথা থাকল, যেদিন আমি সেই অবস্থায় পৌছাতে পারব, সেদিন আমার জন্য একটা বাড়ি তৈরি করার জন্য আপনার কাছেই আমি যাব।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে স্যানটনিক্র বলেছিলেন, দুর্ভাগ্য এটাই যে, তার আগেই আমার দিন ফুরিয়ে আসবে। কত—বড় জোর আর বছর দুয়েক, এই সময়ের মধ্যে কটা কাজ আর শেষ করে উঠতে পারব।

একটু থেমে পরে আবার বললেন, সময়ের আগেই অনেককে চলে যেতে হয়, যদিও যৌবনের মধ্যিখানে এসে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয় না আমার।

আমি বলেছিলাম, তাহলে তো দেখছি আমাকে অতি দ্রুত একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ হয়ে উঠতে হচ্ছে। তা না হলে মনের মত বাড়ি আর কপালে জুটবে না।

এরপর মিঃ স্যানটনিক্রের সঙ্গে দেখা হয়নি আর। তবে প্রায়ই তার কথা আমার মনে পড়ে। তিনি আমার মনের গভীরে দাগ কাটতে পেরেছিলেন।

স্যানটনিক্রের সঙ্গে আমার স্বপ্নের মধ্যে অনিবার্য ভাবে এসে হানা দিত জিপসি একরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে টাওয়ার নামের প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, রহস্যময় জিপসি বুড়ি, তার ছোট্ট ঝুপড়িটি।

আর একটা কথাও বলা দরকার, চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণকালে যেসব মেয়ের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, তাদের কথা, আমার দু-চারজন বিশিষ্ট যাত্রীর কথাও মনে পড়ত।

দুর্জ্ঞেয় একটা অনুভূতি আমার মন জুড়ে বসেছিল। কেবলই মনে হয় দুর্লভ কোন বস্তু যেন আমার অপেক্ষায় রয়েছে, আশ্চর্য কোন সৌভাগ্য। যেন অবিশ্বাস্য কিছু আমার জীবনে ঘটবে।

সম্ভবতঃ আমার মনের অবচেতনে কোন মেয়ের কথাই থেকে থাকবে। ঠিক মনের মত একটা মেয়ে।

কিন্তু ভালবাসার স্পর্শ তখনো জীবনে পাইনি। ভালবাসা কি তা-ও জানি না। নারীর শরীর, তার বিশেষ বিশেষ অংশ, খাঁজখোঁজ—এসবই ছিল বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়।

তবে এমন কোন স্বপ্ন বা কল্পনা আমার ছিল না, কোন ডানা-কাটা পরীর সঙ্গে পথের কোন মোড়ে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যাবে, সেই হবে আমার মনের মত জীবনসঙ্গিনী। দুজন শুধু আমরা দুজনের জন্যই বেঁচে থাকব।

কিন্তু আমি যদি জানতে পারতাম, স্বপ্নও আকস্মিকভাবে কোন একদিন সত্য হয়ে উঠতে পারে—অবচেতনের সমস্ত সুপ্তবাসনা বাস্তব হয়ে দেখা দিতে পারে, আর যদি জানতে পারতাম তার পরিণতি তাহলে আমি চিরকালের মত দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়ে অব্যাহতি পেতে পারতাম।

কিন্তু নিয়তি তো লঙ্ঘন করার উপায় নেই।

।। তিন ।।

নিলামের তারিখটায় হাজির হয়েছিলাম বিচিত্র উপায়ে। আমার সওয়ারী তখন এক প্রৌঢ় দম্পতি।

তাদের চাল-চলন, ব্যবহার কোন কিছুই আমার পছন্দ ছিল না। এমন রূঢ় কথা কখনো

আমি শুনিনি। নিজেদের সুখ সুবিধা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। অন্যের ব্যাপারে লেশমাত্র ভাবনা চিন্তা নেই।

দেখতেও দুজন ছিলেন অতিমাত্রায় কুৎসিত। তাই গোড়া থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে ছিল। কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

মনের ভাব প্রকাশ করবারও উপায় ছিল না। কেননা আমার সেবা ও ব্যবহারের সঙ্গে কোম্পানির সুনাম ও ব্যবসার প্রশ্ন জড়িত।

বাধ্য হয়েই আমাকে অন্য পথ নিতে হল। কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে লণ্ডনে আমার অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলাম, হঠাৎ আমার শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। কোম্পানি যেন অনুগ্রহ করে অন্য কোন ড্রাইভারকে সত্বর এখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

আমার যাত্রী দুজনেরও কিছু বলার ছিল না। আমার অসুস্থতার খবর জানিয়ে সহজেই সব কিছু সামলে নেওয়া গেল। আমি যথাসময়েই নিলামে হাজির হতে পেরেছিলাম।

আগেই বলেছি ইতিপূর্বে কোন নিলামে উপস্থিত হবার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তাই ভেতরে ভেতরে অজানাকে জানার একটা আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার ছিল।

কিন্তু নিলাম আসরে উপস্থিত হয়ে আমাকে পুরোপুরি হতাশ হতে হল। এমন একটা বর্ণহীন নিস্প্রাণ সমাবেশে আসতে হবে কল্পনাই করতে পারিনি।

আধা অন্ধকার একটা থমথমে হল ঘরে মাত্র জনা ছয়-সাত মানুষ উপস্থিত হয়েছে। নিলামদারের চেহারা ভাবলেশহীন আর কণ্ঠস্বর নিস্প্রাণ। সম্পত্তিটার একটা বিবরণ দেবার পরেই ডাক শুরু হল।

যারা নিলাম ডাকতে উপস্থিত হয়েছিল তারা সকলেই সম্ভবতঃ স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। এদের মধ্যে একজনই ছিল পোশাক-আসাকে ফিটফাট, কেতাদুরস্ত। সম্ভবতঃ লণ্ডন থেকে সরাসরি চলে এসেছিলেন। তিনি অবশ্য নিলাম ডাকাডাকির মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা নেননি।

পাঁচ হাজারের বেশি দর উঠল না। নিলামদারের মুখে কেমন একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল। সে ঘোষণা করল এই সম্পত্তির জন্য ন্যূনতম যে দাম বাঁধা ছিল ডাক সেই পর্যন্ত না পৌঁছনোর ফলে আজকের মতো নিলাম বন্ধ রইল।

ফিরে আসার পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তিনি বললেন, সবটাই পণ্ডশ্রম হল। জানতাম এরকমই হবে। আপনাকে তো নিলামে অংশ নিতে দেখলাম না।

আমি জানালাম, তেমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি। ব্যাপারটা কিরকম ঘটে সে সম্পর্কে একটা কৌতূহল ছিল, তাই এসেছিলাম।

—ঘরবাড়ি জমিজমা নিলামের ক্ষেত্রে এরকমই হয়। ওরা এভাবে জেনে নিতে চায়, সম্পত্তিটার বিষয়ে আগ্রহী কারা কারা। এখানে যা দেখা গেল, তিনজনের সামান্য কিছু আগ্রহ আছে।

আমি জানতে চাইলাম, এরা কারা কারা?

—একজন হলেন হেলমিনস্টার গ্রামের মিঃ ওয়াটারবি। জমি কেনা বেচার ব্যবসায় ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই বেশ মোটা পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। লিভারপুলের এক নামী সংস্থার প্রতিনিধিকেও দেখলাম। লণ্ডন থেকেও এসেছিলেন একজন।

যারা যারা এসেছিলেন নিলাম ডাকতে তাদের মধ্যে এই কজনই প্রধান।

ভদ্রলোক কয়েক পা নীরবে হাঁটলেন। তারপর বললেন, দাম বেশি পাবে না, খুব কম দামেই সম্পত্তিটা বিক্রি হয়ে যাবে দেখবেন।

—জায়গাটার একটা দুর্নাম আছে শুনেছিলাম।

—তাহলে আপনিও শুনেছেন জিপসি একরের কাহিনীটা। ওসব মশায় গ্রামের অশিক্ষিত লোকজনের গালগল্প। তবে পথের বাঁকটা বাস্তবিকই একটা মরণ-ফাঁদ বিশেষ। স্থানীয়

পৌরকর্তৃপক্ষ যদি রাস্তাটাতে আরও চওড়া করে ধারে ধারে লোহার রেলিং বসিয়ে দিত তাহলে অতটা বিপজ্জনক থাকত না।

—শুনেছি ওই এলাকাটা নাকি অভিশপ্ত। জিপসিরা নাকি জমিটা ছেড়ে যাবার সময় কি সব অভিশাপ দিয়ে গেছে।

—ওসবে কান দেবেন না মশায়। নিতান্তই গ্রাম্য মানুষের কুসংস্কার। ওসব তোয়াক্কা করলে কি আর লিভারপুলের অতবড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে লোক আসে। মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে ওরাই কিনে নেবে।

অতবড় প্রাচীন প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলে তার ওপর আধুনিক ধাঁচের বাড়ি করা কিরকম ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার বুঝতে পারছেন। কজনের সামর্থ্যে কুলোবে বলুন।

আজকাল লোকে বনেদী অঞ্চলে ফ্ল্যাট কেনাটাই বেশি পছন্দ করে। অত জায়গা নিয়ে বাগানবাড়ির দিকে ঝোঁক নেই কারো।

—আধুনিক ছাঁদের বাড়ি তো এই জমিটার ওপরেও তৈরি করা চলে।

—তা যায়। কিন্তু শহর এলাকা ছেড়ে অমন নির্জন জায়গায় কে বসবাস করতে আসবে বলুন।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে বাঁদিকের পথ ধরলেন। আমি যেমন চলছিলাম, তেমনই সোজা চলতে লাগলাম।

কোথায় যাব সে বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না আমার। আপনা থেকেই যেন পা জোড়া আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিল সর্পিল পাহাড়ী পথে।

এই ছায়াঘেরা পাহাড়ী পথেরই এক বাঁকের মুখে এসে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইলিয়ার। এক ফার গাছের নিচে একা দাঁড়িয়ে ছিল ও।

আয়ত চোখের গভীরে যেন এক অজানা স্বপ্নের ঘোর। গাঢ় সবুজ টুইডের পোশাক পরা। মাথায় একরাশ বাদামী চুল।

আমার মনে হল যেন আচম্বিতেই এক বনদেবীর আবির্ভাব হয়েছে সামনে। আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মেয়েটিও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। মনে হল কিছু যেন বলতে চেয়েছিল। কিন্তু বলল না।

আমি সহসা সংযত বিনীত কণ্ঠে বললাম, মাপ করবেন, আপনাকে চমকে দেবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না। এখানে আর কেউ যে আছে আমি বুঝতেই পারিনি।

মৃদু হেসে ইলিয়া বলল, না, না, আপনি বৃথাই সঙ্কুচিত হচ্ছেন। চারপাশটা কেমন অদ্ভুত নির্জন, আমি তাই দেখছিলাম।

এই জনপ্রাণীহীন পাহাড়ী পরিবেশে কথা বলার মত একজন সঙ্গী পেয়ে ভালই লাগল। বললাম, সত্যিই এখানে কেমন একটা গা-ছমছম ভাব যেন।

পাহাড়ের ওপরের ওই প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এই পরিবেশকে যেন আরও গুরুগম্ভীর করে তুলেছে।

—হ্যাঁ ওই বাড়িটার নাম নাকি টাওয়ার।

আমি মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললাম, হ্যাঁ আমিও শুনেছি।

মেয়েটির ঠোঁটে হাসির আভাস খেলল। বলল, জায়গাটা নাকি নিলামে বিক্রি হবার কথা হচ্ছে।

আমি হেসে বললাম, সেই নিলাম থেকেই তো আমি আসছি।

—তাই বুঝি। আপনিও বুঝি জমিটার ব্যাপারে আগ্রহী।

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, না না, আমি নিতান্তই একজন সাধারণ ব্যক্তি। ওরকম ভাঙাচোরা বাড়ি আর পতিত জমি কিনে নেবার মত সামর্থ্য আমার নেই।

—জায়গাটা কি বিক্রি হয়ে গেছে?

—না। বাঁধা দামটা ওঠেনি বলে ডাক স্থগিত করা হয়েছে। আপনিও নিশ্চয় এমন একটা জায়গা কিনতে চান না।

—অবশ্যই না।

—তবে, সত্যি কথা বলতে জায়গাটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। টাকা থাকলে আমি কিনে নিতাম।

—কিন্তু বাড়িটাতো একটা ধ্বংস্তূপ বিশেষ।

—তা ঠিক। তবে সাবেকী বাড়ি থাকা না থাকা সমান। তার প্রতি আমার কোন মোহ নেই। পরিবেশটা বড়ই মনোরম। এদিকটায় দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ, পাহাড়ের সারি, ও দিকটায় রয়েছে অন্তহীন নীল জলরাশি—

সব মিলিয়ে বড় মোহময়। আসুন দেখবেন। বলে মেয়েটির হাত ধরবার জন্য আমি হাত বাড়ালাম।

আমার ব্যবহারে শিষ্টাচারের ব্যাঘাত ঘটল কি না সেকথা সেই মুহূর্তে মনে হল না। কেন না মেয়েটিকে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

সে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল। তাকে আমি পাশেই একটা জায়গায় নিয়ে এলাম।

এরপর তাকে সমুদ্রে যাবার আঁকাবাঁকা পথ, সারিবদ্ধ পাহাড়ের চুড়ো, তাদের কোলে ছোটখাট শহরটি, দুপাশে পাহাড়ের মধ্যে সবুজ আরণ্যক উপত্যকা, সব একে একে দেখিয়ে দিলাম।

পরিবেশের প্রভাবেই আমি হয়তো কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। বললাম, এই মনোমুগ্ধকর পটভূমিতে ফাঁকা জমির ওপর ঠিক প্রকৃতির অঙ্গ করেই বড় সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করা যায়।

তবে যথার্থ প্রতিভাবান স্থপতি হলেই তেমন একটি বাড়ি তৈরি সম্ভব হবে।

মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে আমার কথা শুনছিল। কথা শেষ হলে বলল, তেমন দক্ষ স্থপতি কি আপনার জানা আছে?

—তেমন একজনকে অবশ্য আমি জানি। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

কথা বলতে বলতে একটা গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসলাম আমরা। আমি তাকে স্যানটনিক্সের কথা বললাম। প্রসঙ্গক্রমেই আমার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎকার কালের কথাগুলোও এসে পড়ল।

নবপরিচিতা মেয়েটির সঙ্গে এভাবেই কথা বলতে যেন অতি সহজেই অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। আমাদের সম্বোধন আপনি থেকে তুমিতে পৌঁছে গেল। সম্ভবতঃ পরিবেশই এভাবে অতি সামান্য সময়ের মধ্যে আমাদের দুজনকে কাছে এনে দিল।

সেই পাহাড়ী নির্জন পরিবেশে একজন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে সহজ অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলার সুযোগ পাব, এখানে আসার আগে ভুলেও চিন্তায় আসেনি।

আমরা দুজনেই দুজনের কাছে অপরিচিত। কোনদিন কেউ কাউকে দেখিনি পর্যন্ত। কিন্তু তবু আলাপ পরিচয়ের ফাঁকে তার কাছে আমি আমার নানান রঙিন স্বপ্নের কথা নিঃসঙ্কোচেই খুলে বলতে পারলাম।

আমার আবাল্যপোষিত মনের মত একখানি বাড়ির কথা শুনে ইলিয়া বলল, এমন একটা বাড়ির সাধ বহুদিন থেকে আমিও মনে পোষণ করে রেখেছি। এখন মনে হচ্ছে এরকম একটা পরিবেশই আমার স্বপ্নের মধ্যে ছিল।

সত্যিই একেবারে প্রকৃতির নিজস্ব লীলানিকেতন। শহরের যন্ত্রণাময় কোলাহল এখানে পৌঁছবে না, নগরজীবনে কৃত্রিমতার ছোঁয়া বাঁচিয়ে শিষ্টাচার আর রীতিনীতির বেড়াজালের বাইরে একান্ত নিজের মত করে বেঁচে থাকার ইন্ধন এখানে ভরপুর।

এখন মনে হচ্ছে এটাই আদর্শ জায়গা। আমিতো রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছি।

আমি আর ইলিয়া—দুজনের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতটা এভাবেই হয়েছিল।

সেদিন ইলিয়াই প্রথম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার নাম?

বলেছিলাম, মাইকেল রজার। তুমি মাইক বলে ডেকো।

—তোমার নাম তো বললে না।

—আমার? কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বলেছিল, ফিনেলা, ফিনেলা গুডম্যান।

ওকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে আমার সন্দেহ হল, ওকি আমাকে আসল নাম গোপন করল? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, মনগড়া নাম কেন বলতে যাবে, আমিতো তাকে আসল নাম গোপন করিনি। আমার ধারণাটা ঠিক নয়।

সেদিন খুব বেশি কথা না হলেও যতক্ষণ কাছাকাছি ছিলাম, দুজন দুজনকে লক্ষ্য করেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম দুজনেরই অনেক ব্যক্তিগত কথা বলার ছিল, কিন্তু প্রথম দিনেই মানসিক আড়ষ্টতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আর সেই কারণেই কবে আবার দেখা হতে পারে, কোথায় দেখা হতে পারে, কে কোথায় থাকি এসব কথা জিজ্ঞেস করবার সাহস পাচ্ছিলাম না।

ফাঁকা জায়গায় ঠাণ্ডাটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। তাই একসময় আমরা সেই প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছেড়ে নিচে নেমে চললাম।

চলতে চলতে আচমকাই আমি প্রশ্ন করে বসলাম, মিস গুডম্যান, তুমি কি আশপাশেই কোথাও থাক?

ফিনেলা জানালো সে মার্কেট কডওয়েলের একটা হোটেলে উঠেছে। আমি অনুমান করলাম এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরের বাণিজ্যকেন্দ্র কডওয়েলের কোন অভিজাত হোটেলেই সে উঠেছে।

পরক্ষণেই আমাকে ও জিজ্ঞেস করল, রজার, তোমার বাড়ি কোথায়?

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললাম, আমি থাকি অনেক দূরে। কেবল আজকের জন্যই এখানে এসেছিলাম।

সামনের গ্রামের একটা সরাইখানার ধারে ফিনেলা তার গাড়ি রেখে এসেছিল। সেই অবধি আমরা গল্প করতে করতে হেঁটেই যাব ঠিক করলাম।

পাহাড়ী রাস্তাটা সাপের মত এঁকেবেঁকে নিচে নেমে গেছে। এই পথেরই একটা মোড় দুর্ঘটনার জন্য কুখ্যাত হয়েছে।

খানিকটা পথ এগুবার পর একটা বাঁকের মুখে আচম্বিতে আমাদের চোখের সামনে একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হল। একটা ঝাঁকড়া মাথা ঝাউ গাছের আড়ালে ছিল, সেখান থেকেই পথের ওপরে এসে দাঁড়াল মূর্তিটা।

ইলিয়া আর্ত চিৎকার করে পেছনে সরে এল। আমিও প্রথমে হকচকিয়ে গেলাম। পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার আগের দেখা সেই জিপসি বুড়ি লী।

তার চেহারা আজ আরও বেশি উগ্র আর ভয়ঙ্কর। মাথার রুক্ষ চুলের রাশি সাপের লেজের মত বাতাসে উড়ছে। গায়ে একটা লাল রঙের পোশাক।

খনখনে গলায় বুড়ি প্রশ্ন করল, এই জিপসি একরে এসেছ কি উদ্দেশ্যে? দুটিতে মিলে জোড় বেঁধেছ?

জবাবটা দিল ইলিয়াই। বলল, কেন, এতে দোষের কি হল? তাছাড়া কারুর জমিতেও আমরা বেআইনী প্রবেশ করিনি।

—এটা ছিল আমাদের এলাকা—মানে জিপসিদের। সেই জন্যেই জায়গাটার নামও হয়েছে জিপসি একর। কিন্তু, জানতো ওরা জিপসিদের থাকতে দেয়নি। গায়ের জোরে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পুরো এলাকা দখল করে নিয়েছে। সেই থেকে এখানকার হাওয়ার সঙ্গে

জিপসিদের অভিশাপ মিশে আছে।

এখানে কারোর কোনদিন মঙ্গল হয়নি। তাই তো তোমাদের বলছি, এখানে এভাবে ঘুরে বেড়ানোটা তোমাদের পক্ষেও শুভ হবে না।

ইলিয়া মুহূর্তের জন্য যেন থমকে গেল। পরে শান্ত সংযত কণ্ঠে বলল, এ জায়গাটা নিলাম হচ্ছে শুনলাম তাই দেখতে এলাম। চমৎকার জায়গাটা। খুবই ভাল লাগল।

বুড়ি কর্কশ কণ্ঠে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, শোন বাছারা, এ জমি কেনার মন করো না। যে কিনবে জমির সঙ্গে দুর্ভাগ্যও তার ঘাড়ে চাপবে।

তোমাদের দুটিকে দেখতে বেশ সুন্দর। তাই তোমাদের ভালর জন্যেই বলছি, এখানে ঘোরাঘুরি করে নিজেদের দুর্ভোগ ডেকে এনো না।

বহু যুগ আগে থেকে এ এলাকা অভিশপ্ত হয়ে আছে। যে কিনবে তার কখনো মঙ্গল হবে না। জিপসি একর থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করবে। মনেও ঠাঁই দিও না। আমি জানি এখানে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে মৃত্যুর হিম নিশ্বাস। মরবে—নির্ঘাৎ মরবে যে এখানে আসবে।

যারা এসেছিল সব মরে ভূত হয়ে গেছে। মনে রেখো এটা জিপসি বুড়ির সতর্কবার্তা।

গায়ে কাঁটা ধরানো বুড়ির কথাগুলো ধৈর্য ধরে শুনল ইলিয়া। পরে বলল, আমরা তো কারো ক্ষতি করছি না।

আমিও এগিয়ে গিয়ে বললাম, শোন বুড়ি, কেন তুমি মিছে এই মহিলাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ! আমরা তো চলেই যাচ্ছি।

পরে ইলিয়াকে বললাম, বুড়ি লী এই গ্রামেই থাকে। বুড়ির গুণও কম নয়। ভাল হাত দেখতে জানে। কি বল মিসেস লী?

বুড়ি জবাব দিল, হ্যাঁ, সে ক্ষমতা আমার আছে। আমাদের জিপসি সম্প্রদায়ের সকলেই জন্মসূত্রে এই ক্ষমতার অধিকারী। তোমার দুহাতের তালু দুটো মেলে ধরো তো মেয়ে, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভাল মন্দ সব খবরই আগাম জানিয়ে দেব। কেবল একটা রৌপ্য মুদ্রা আমার মজুরি।

ইলিয়া বলল, কিন্তু আমিতো আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কিছু জানতে চাই না।

—নারে মেয়ে, ওটা বুদ্ধিমানের কথা নয়। আগে থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানা থাকলে বিপদ আপদ ঘায়েল করতে পারে কম, তাই না? ভবিষ্যৎ শুনলেই ঘাবড়ে যাবার কি আছে। তোমার তো অঢেল ঢাকা।

ওই কোটের পকেটেও টাকার অভাব নেই। কি করে চললে মঙ্গল হবে, সব আমি তোমাকে বলে দেব।

আমি কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ইলিয়ার দিকে তাকিয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ জানার ব্যাপারে মেয়েদের দুর্বলতা আমি আগাগোড়া দেখে এসেছি।

ইলিয়াও তার ব্যতিক্রম হল না। নিজের ব্যাগ খুলে আধ ক্রাউনের দুটো মুদ্রা বের করে বুড়ির হাতে দিল।

—এই তো সোনা মেয়ে। তোমার উপযুক্ত কাজই তুমি করেছ। এবার জিপসি বুড়ির কথা মন দিয়ে শোন। বলে হাতের থাবা পাতল।

ইলিয়া পশমের দস্তানা খুলে বাম হাতের পেলব তালু সামনে মেলে ধরল।

হাতটা চোখের সামনে টেনে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বুড়ি খানিকক্ষণ রেখাগুলো দেখল। দেখতে দেখতে তার ক্লিষ্ট বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে অদ্ভুত থমথমে ভাব ফুটে উঠল। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে লাগল—এ আমি কি দেখছি—এ আমি কি দেখছি—

বলতে বলতে ইলিয়ার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, যত শীঘ্র পার এখান থেকে পালিয়ে যাও।

জিপসি একর তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। এখানকার অভিশাপের কথাতো তুমি শুনেছো, তবু কেন এলে?

তোমার হাতের রেখা আমাকে স্পষ্ট অশুভ কথা বলছে। এখনো সময় আছে অভিশপ্ত জিপসি একর ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাও।

ভুলেও কখনো মনে করো না। জিপসি বুড়ি লীর কথা অগ্রাহ্য করো না, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে না। এখানকার বাতাসে অভিশাপের বিষ ছড়িয়ে আছে, গায়ে লাগলে রক্ষে নেই।

—বুড়ি, তুমি দেখছি, সকলকেই ভয় দেখিয়ে জিপসি একর থেকে তাড়াতে চাইছ। এই মহিলা নেহাৎ বেড়াতে বেড়াতেই এখানে চলে এসেছেন। জিপসি একরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।

রীতিমত ধমকের সুরেই বললাম বুড়িকে।

বুড়ি কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না। সে ইলিয়াকে লক্ষ্য করে বলেই চলল, তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে সাবধান করে দিতে চাইছি মেয়ে।

তোমার দয়ার শরীর। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তুমি জন্মেছ। কিন্তু বিপদ সম্পর্কে সাবধান না হলে সেই সুখও টেকে না। আমার কথা মনে রেখো, যে জায়গা অভিশপ্ত, বিপজ্জনক, তেমন জায়গায় কখনো পা দেবে না।

সবসময় সতর্ক থাকবে, সাবধানে চলাফেরা করবে। আমার এই নির্দেশ যদি অগ্রাহ্য কর তাহলে কিন্তু—না সে কথা আমি ভাবতেও চাই না। না না, তোমার হাতের ওই রেখাগুলো আর দেখতে চাই না।

বুড়ি লীর হাত কাঁপছিল। সে ইলিয়ার দেওয়া মুদ্রা দুটো অদ্ভুত ভঙ্গীতে আবার তার হাতেই গুঁজে দিল।

তার মুখে কিন্তু বিরাম ছিল না। স্বগতোক্তির মত কি যে বলে চলেছে, সব বোঝা যাচ্ছিল না। কয়েকটা টুকরো কথা কেবল কানে এলো—হায় বিধাতা—একী তোমার খেলা—নিয়তি কি নিষ্ঠুর কেউ রেহাই পায় না।

জিপসি বুড়ি লী আর সেখানে দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে সেখান থেকে সরে গেল।

ইলিয়া বুড়ির গমনপথের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। স্বগতোক্তির মত তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—বাপরে, কি সাংঘাতিক বুড়ি।

ইলিয়াকে স্বাভাবিক করে তুলবার জন্য বললাম, বুড়ির মাথার ঠিক নেই। সকলকে ভয় দেখানোর বাতিকগ্রস্ত। এসব কথার কখনো গুরুত্ব দিতে নেই।

ইলিয়া জানতে চাইল, এখানে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তাই না?

—এই রাস্তার কয়েকটা বাঁক খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া রাস্তাটাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক সরু। দুর্ঘটনা ঘটবার মত জায়গাই এটা। অথচ স্থানীয় পৌরপ্রশাসন মনে হচ্ছে এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়। এদের নামে মামলা করা উচিত।

ইলিয়া যেন কেমন ঘোরের মধ্যে পড়েছে মনে হল। বলল, শুধুই মোটর দুর্ঘটনা, না অন্য আরো—

—পথেঘাটে বিশেষ করে এরকম পাহাড়ী পথে কতরকমের দুর্ঘটনাই ঘটতে পারে। কিন্তু গ্রামের মানুষের তিলকে তাল করে তোলাই স্বভাব। এভাবেই অভিশাপ শব্দটা এই জায়গাটার কপালে জুটেছে।

—এখন বুঝতে পারছি, এই কারণেই সম্পত্তিটার দাম উঠছে না।

ইলিয়ার গলার স্বর কাঁপছিল। লক্ষ্য করে বললাম. অনেকটা পথ যেতে হবে। চল তাড়াতাড়ি নেমে পড়া যাক।

চলতে চলতেই এক ফাঁকে বলে ফেললাম, আগামীকাল আমার একবার মার্কেট কডওয়েলে যাবার কথা আছে। সেখানে আমাদের কি আবার দেখা হতে পারে?

ইলিয়া বলল, তা সম্ভব হতে পারে। সন্ধ্যার ট্রেনে লণ্ডনে ফিরে যাব আমি। বিকেলে দেখা হতে পারে।

—তাহলে কোন কাফেতে—ব্লু ডগ অথবা—

ইলিয়া হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। কি জানি কেন। পরে বলল, ব্লু ডগ খুবই ভাল কাফে—ঠিক আছে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আমি সেখানে পৌঁছে যাব।

ইলিয়া সহজভাবে সাড়া দিয়ে আমাকে শঙ্কামুক্ত করল। আমি উল্লাসভরে বলে উঠলাম, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

ততক্ষণে আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে পৌঁচেছি। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার লগ্ন এসেছে। সহসা ইলিয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা জায়গাটা কি সত্যিই ভীতিজনক ?

আমি এবারে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। বললাম, জিপসি বুড়ির প্রলাপগুলো দেখছি এখনো তোমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

এখানে ভয় পাবার মত তো কিছুই আমার নজরে পড়ল না। গ্রামের লোকে যাই বলুক জিপসি একর আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মনের মত বাড়ি বানাতে হলে এমন প্রাকৃতিক পরিবেশই উপযুক্ত।

পরদিন বিকেলে মার্কেট কডওয়েলে আবার আমাদের দেখা হল। চা খেতে খেতে আমরা গল্প করলাম। কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে কথা বিশেষ হল না। বাইরের নানা বিষয় নিয়ে গল্প করতে করতেই সময় কেটে গেল।

কথায় কথায় ইলিয়া জানাল, গতকাল যে গাড়িটার কথা বলেছিল সেটা তার নিজের গাড়ি নয়। তবে সেটা কার সেকথা খুলে বলল না।

সাড়ে পাঁচটায় ইলিয়ার গাড়ি ছাড়বার কথা। তার অনেক আগেই আমরা উঠে পড়লাম। চায়ের বিল আমি মিটিয়ে দিলাম।

ইলিয়া একসময় বলল, আগামী দু সপ্তাহ আমি লণ্ডনেই আছি।

তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আমার ভাল লাগল। বললাম, তাহলে কোথায় কখন—

তিনদিন পরে রিজেন্ট পার্কের নির্ধারিত স্থানে আবার আমাদের দেখা হল। এই নিয়ে তৃতীয়বার।

দিনটা ছিল ঝকঝকে। একটা রেস্তোরাঁয় বসে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম, তারপর কুইন মেরীর বাগানে কিছু সময় ঘুরে বেড়ালাম। তারপর বাগানের এক নির্জন প্রান্তে ডেক চেয়ারে বসে গল্প জুড়লাম।

আজ আমি ইচ্ছে করেই নিজের ব্যক্তিগত কথা কিছু বললাম। খুব সাধারণ একটা স্কুলে আমি লেখাপড়া শিখেছিলাম।

স্কুল ছাড়ার পরেই শুরু হয়ে যায় আমার বিচিত্র বর্ণময় জীবন। একটা অন্তর্নিহিত অস্থিরতা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

কোন একটা কাজে বেশি দিন লেগে থাকতে পারতাম না। কিছুদিন পরেই একঘেয়ে লাগত। সবকথাই আমি খুলে বললাম।

ইলিয়া আমার যাযাবর জীবনের কাহিনী শুনে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, আমাদের দুজনের জীবনধারা দেখছি একেবারে বিপরীত।

আমি হালকা সুরে বললাম, তুমি ধনী মহিলা—

—কিন্তু ভাগ্যহত।

—ভাগ্যহত?

—হ্যাঁ।

এরপর একটু একটু করে নিজের জীবনকাহিনী শোনাল ইলিয়া। ওদের বিপুল সম্পদের কথা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ধনীদের জীবন যে কত ক্লান্তিকর, দুর্বিষহ সবই খুলে বলল।

আভিজাত্যের কৃত্রিম বেড়াজাল চারপাশে। নিজের খেয়াল খুশিমত সেখানে কোন কিছু করার সুযোগ নেই। বন্ধুবান্ধব নির্বাচনের ব্যাপারেও স্বাধীনতা থাকে না। সারাক্ষণ মাপাকথা, মাপাহাসি।

পুতুলের মত হাত পা নেড়ে কেবল নিয়ম রক্ষা করে যেতে হয়। পাছে মুখোস না একটু খসে পড়ে সেজন্য আশপাশের সকলের সদাসতর্ক নজর আর খবরদারি। খুব অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছে ইলিয়া। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। বছর কয়েক আগে বাবাকেও হারিয়েছে সে। ঘরে এখন সৎমা।

স্পষ্ট করে না বললেও বুঝতে অসুবিধা হল না যে সৎমায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর নয়। ভদ্রমহিলা বছরের অর্ধেকটাই কাটান আমেরিকায়। বাইরে ঘুরে বেড়ানোটাই তাঁর জীবন।

আমার কাছে ওর জীবন এক অবিশ্বাস্য যন্ত্রণার জীবন বলেই মনে হল। প্রভূত বিত্তের মালিক হয়েও কৃত্রিম নিয়মের নিগড়ে দুঃসহ বন্দিজীবন।

সমগ্র পরিবেশ, আনন্দ অনুষ্ঠান, কোথাও আনন্দের ছিটেফোঁটা নেই শুনতে শুনতে আমার যেন দম আটকে আসতে লাগল।

সব শুনে মনে হল বাস্তবিকই আমাদের দুজনের জীবনে কোথাও মিল নেই অতটুকু। দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা—কথাটা আমাদের জন্যই যেন তৈরি হয়েছিল।

—তাহলে তো দেখছি তোমার কোন বন্ধু নেই, আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম, পুরুষ বন্ধুও কি নেই?

—বন্ধু কেউ নেই। বাছাই করা এমন পুরুষদের সঙ্গে আমাকে মিশতে দেওয়া হয় যে তাদের সঙ্গ বড় বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকর।

—বন্ধু ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে? তোমার প্রাণের বন্ধু—

—একজন তেমন আছে—গ্রেটা তার নাম।

—গ্রেটা কে?

—আমাকে জার্মান ভাষা শেখাবার জন্য গ্রেটাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মেয়েটি অন্য সকলের চেয়ে একেবারেই আলাদা। সে আমাকে নানাভাবে সাহায্যও করে।

একটু চুপ করে থেকে কি ভাবল ইলিয়া। পরে আবার বলতে লাগল।

ওর জন্যই আমি খানিকটা হাঁপ ছাড়তে পেরেছি। মাঝে মাঝে মর্জিমাফিক ঘুরে বেড়াতে পারি। আমার জন্য বেচারীকে মিথ্যেও বলতে হয় ঝুড়ি ঝুড়ি। জিপসি একরে আসার সুযোগ পেয়েছি ওরই জন্যে।

আমার সৎমা এখন প্যারিসে। আমি যে কদিন লণ্ডনে থাকব, আমার দেখাশোনা করবার জন্য গ্রেটাও থাকবে আমার সঙ্গে।

সপ্তাহে তিনটে করে চিঠি সৎমাকে লিখতে হয়। আমি যখন লণ্ডনের বাইরে যাই, দু-তিনখানা চিঠি লিখে গ্রেটার কাছে রেখে আসি। ও কয়েক দিন অন্তর সেগুলো ডাকে পাঠিয়ে দেয়। সৎমা বুঝতে পারেন আমি লণ্ডনেই আছি।

মৃদু হেসে আমি বলি, হঠাৎ করে এই জিপসি একরে আসতে গেলে কেন?

—আমি আর গ্রেটা মিলে ঠিক করেছিলাম। সত্যি বন্ধু হিসেবে গ্রেটার তুলনা হয় না।

আমি সকৌতুকে জিজ্ঞেস করি, তোমার এই বন্ধুটি দেখতে কেমন?

—গ্রেটা সুন্দরী। দেহের গড়নও চমৎকার। তার ওপরে অসম্ভব বুদ্ধিমতী। ইচ্ছে করলে গোটা পৃথিবী গ্রেটা জয় করে নিতে পারে। তুমিও তাকে পছন্দ না করে পারবে না।

আমি বিনীত কণ্ঠে বলি, মেয়েদের বেশি বুদ্ধি থাকাটা আমি হজম করতে পারি না। তাছাড়া

গ্রেটা তোমার এত বেশি প্রিয়পাত্র যে আমি হয়তো তাকে হিংসে না করে পারব না।

—গ্রেটাকে তুমি হিংসে করো না। ও আসার পর থেকে আমার জীবনটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে।

—কিন্তু গ্রেটা তোমাকে এখানে আসার পরামর্শ কেন দিল তা বুঝতে পারছি না। জিপসি একরে দর্শনীয় কিছুতো নেই। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় ঠেকছে।

—সেটা একটা গোপনীয় বিষয়, আমি আর গ্রেটাই কেবল জানি।

—আচ্ছা, আমাদের এই দেখা-সাক্ষাতের কথাও কি গ্রেটা জানে?

—জানে, তবে বন্ধুটি কে বা তার পরিচয় কি সে বিষয়ে কিছু জানে না। আমি সুখী, এতে সে আনন্দিত।

এরপর সপ্তাহখানেক ইলিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তার সৎমা প্যারিস থেকে ফিরে এসেছেন। তার সঙ্গে আর একজনও এসেছেন, ইলিয়া তাকে ফ্র্যাঙ্ককাকা বলে ডাকে।

কয়েকদিন পরেই লণ্ডনে ইলিয়ার জন্মদিন পালিত হবে। সেই উপলক্ষ্যে সকলেই নাকি খুব ব্যস্ত।

একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। গ্রেটা নামের মেয়েটি ইলিয়ার জীবনের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে। তার প্রশংসায় সর্বদাই সে পঞ্চমুখ। কেবল তাই নয় অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না।

ইলিয়ার বিমাতা ও অন্যান্য অভিভাবকরা তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রেটার ওপরই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন।

তার ফ্র্যাঙ্ককাকার বিষয়ে ইলিয়া জানিয়েছিল, তিনি ঠিক তার কাকা নন—পিসেমশাই। তার সঙ্গে রক্তসম্পর্ক নেই।

অদ্ভুত প্রকৃতির এই মানুষটা সর্বদা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কোন কাজ করেন না, কিন্তু খরচের বেলা বেহিসাবী। ইলিয়ার ধারণা তার কাকাটি সঙ্গী হিসেবে চমৎকার। তবে মাঝে মাঝে যেন কেমন হয়ে যান—

দেখাসাক্ষাতের মধ্য দিয়ে আমরা দুজন দুজনের অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ইলিয়া কখনো তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য উৎসাহ দেখায়নি।

ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। একদিন আমি নিজে থেকেই কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

ইলিয়া মৃদু হেসে বলল, না, মাইক, এখনই তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক, আমি তা চাই না। কথাটা শুনে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছিলাম, আমি অবশ্য খুবই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, নিতান্তই নগণ্য...

ইলিয়া বলল, না মাইক, আমি সেকথা বলতে চাইনি। আসলে আমাদের সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে তখনই সকলে মিলে নানাভাবে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করবে। সেটা আমার বাঞ্ছিত নয়।

আমি বললাম, আমার যেন মনে হচ্ছে, কেমন একটা লুকোচুরি খেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

ইলিয়া বলল, আমার বয়স একুশ হতে চলল। একুশে পড়লেই আমি পছন্দমত আমার সঙ্গী নির্বাচন করার আইনসিদ্ধ অধিকার লাভ করব।

কেউই তখন আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আমার কথা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ।

একুশ বছরে পড়বার আগে সেকারণেই একটা গণ্ডগোল বাধাতে চাইছি না। তাহলে হয়তো আমাকে দূরে এমন কোথাও কৌশল করে পাঠিয়ে দেবে যে তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখাই সম্ভব হবে না। কটাদিন একটু ধৈর্য ধর মাইক...

—তোমার অসুবিধাটা আমি অনুধাবন করতে পারছি। তবে আমি এভাবে আড়ালে থাকার পক্ষপাতী নই বললাম।

আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে জিপসি একরের প্রসঙ্গও এসে পড়ত। অবশ্য ইলিয়া নিজেই উত্থাপন করত।

কেমন স্বপ্নাবিষ্ট গলায় বলে উঠত, আচ্ছা আমরা যদি জিপসি একর জায়গাটা কিনে নিই। কেমন হয়? পরে সেখানে একটা বাড়ি তুলব—

ইলিয়ার কাছে স্যানটনিক্সের অনেক গল্পই করেছিলাম। আমি বুঝতে পারতাম না তার বাড়ি তৈরির কল্পনার সঙ্গে তার নামও জড়িয়ে ছিল কিনা।

ইতিমধ্যে আমি ইলিয়ার জন্য একটা সবুজ আংটি কিনে রেখেছিলাম। সেটা আমার তরফ থেকে তার জন্মদিনের প্রীতি উপহার স্বরূপ তুলে দিলাম। আনন্দে ইলিয়ার দু'চোখ ঝকঝক করে উঠল।

বলল, জন্মদিনে অনেক উপহারই আমি পেয়েছি। তবে এটাই সবচেয়ে সুন্দর আর মূল্যবান।

ইলিয়া দু-একটা গয়না যা পরে থাকত, তা সবই মূল্যবান হীরে-জহরত বসানো। কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম আমার আংটিটা পেয়ে সে অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

দিন কয়েক পরে ইলিয়ার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। সে জানিয়েছে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে যাচ্ছে, হপ্তা তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবে। আমি যেন বিশেষ চিন্তিত না হই।

ফিরে এসে আবার আমাদের দেখা হবে। সে এবারে একটা জরুরী বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবে।

ইলিয়ার দর্শনবিহীন তিনটা সপ্তাহ খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটল আমার। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে ইলিয়া ও আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এই সম্পর্কের পরিণতি কি তা বুঝতে পারছিলাম না।

ইতিমধ্যে জিপসি একর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সম্পত্তিটা কিনে নিয়েছে লণ্ডনের এক সলিসিটর সংস্থা। তবে কার নির্দেশে কেনা হয়েছে সে সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি।

সময় যেন কাটতে চাইছিল না। মন ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় একদিন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনেক দিন তাঁর কাছে যাওয়া হচ্ছিল না।

।। চার ।।

আমার মা গত কুড়ি বছর ধরে একটা বাড়িতে বাস করছেন। মায়ের ফ্ল্যাটের নম্বর ছেচল্লিশ। কলিং বেলের বোতাম টিপতে মা নিজেই এসে দরজা খুলে দিলেন। নির্বিকার ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে বললেন, ওঃ তুমি! এসো।

মায়ের পাশ কাটিয়ে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

আমার মা স্নেহময়ী। কিন্তু তা কখনো বাইরে প্রকাশ হতে দেননি। আমার অস্থির জীবনধারা তাঁকে পীড়া দিত, আমাকে শুধরাবার অনেক চেষ্টাই তিনি করেছেন। তবে সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি।

এই নিয়েই দুজনের সম্পর্ক একটা অস্বস্তিকর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভেতরে এসে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মা। পরে বললেন, অনেকদিন পরে এলে। এতদিন কি করছিলে?

—এই যা করি, নানান রকম কাজ।

—আমার সঙ্গে শেষবার দেখা হবার পর এর মধ্যে কতগুলো নতুন চাকরি করলে?

আমি মৃদু হেসে বললাম, গোটা পাঁচেক।

—তুমি কি আর সাবালক হবে না?

—আমি তো পূর্ণমাত্রায় সাবালক এখন। আমি আমার নিজের পথ বেছে নিয়েছি। তা তুমি কেমন আছ?

—আমার অবস্থাও তোমারই মত, কোন পরিবর্তন নেই।

একটু থেমে হঠাৎ সুর পাল্টে মা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হঠাৎ এভাবে হাজির হবার কি কারণ ঘটল?

—তোমার কাছে কি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে হবে?

—তোমাকে তো তাই দেখে আসছি।

—আচ্ছা, মা আমি এই দুনিয়াটাকে বুঝতে জানতে চাই, এতে তোমার এত আপত্তি কেন, বলতো?

—একটার পর একটা চাকরি ছাড়াই কি তোমার পৃথিবীকে জানা বোঝা?

—তাই তো।

—এতে তুমি কতটা সফল হবে আমার মাথায় ঢোকে না।

—আমি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পথেই তো এগিয়ে চলেছি।

এরপর মা দু পেয়ালা কফি নিয়ে এলেন। প্লেটে করে আমাকে হাতে তৈরি কেক দিলেন। আমি আর মা মুখোমুখি বসলাম।

মা বললেন, এবারে তোমাকে কিছুটা অন্যরকম লাগছে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালাম। মা বললেন, কি এমন ব্যাপার ঘটল, বলতো?

—কিছুই ঘটেনি।

—কিন্তু তোমাকে একটু উত্তেজিত লাগছে।

—হ্যাঁ, তুমি তো আমার সবকিছুই জেনে বসে আছ।

—না, তা জানি না। তোমার জীবনযাপন এমন যে আমার পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব না। কিন্তু এবারে ব্যাপারটা কি? তোমার কোন বান্ধবী—

আমি হেসে বললাম, তুমি দেখছি কাছাকাছি চলে এসেছ!

—মেয়েটি কেমন?

—ঠিক আমার মনের মত।

—তাহলে তাকে কি আমার কাছে নিয়ে আসছ?

—না।

—কেন, পাছে আমি তোমায় নিষেধ করি?

—তোমার ওজর আপত্তি কি আমি গ্রাহ্য করি?

—তা না করলেও, ভেতরে একটা নাড়া তো পাবেই। মেয়েটা কি কোনভাবে তোমাকে হাত করে ফেলেছে?

—ওসব কিছুই নয় মা। ওকে দেখলে তুমি খুশি হবে।

—তুমি তাহলে এখন আমার কাছে কি চাও?

—আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন।

—কেন, ওই মেয়েটার পেছনে খরচ করবে বলে?

—না, বিয়ের জন্য আমাকে একটা ভাল পোশাক কিনতে হবে।

—তাহলে ওই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ?

—তার তরফ থেকে যদি কোন আপত্তি না থাকে।

মায়ের মুখ ভাব হঠাৎ পাল্টে গেল। কঠিন ভাবটা সরে গেল। বিচলিত কণ্ঠে বললেন, খোকা, আমাকে যদি সব খুলে বলতে!

তারপর আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন, আমি বুঝতে পারছি, সাংঘাতিক কোন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এই আশঙ্কাটাই আমার ছিল, পাত্রী নির্বাচনের

ব্যাপারে তুমি ঠিক ভুল করে বসবে।

—আমার পাত্রী নির্বাচনে ভুল হয়েছে—তোমার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে।

আমার মাথার ভেতরে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নেমে পড়লাম।

।। পাঁচ ।।

বাসায় এসেই অ্যান্টিবাস থেকে পাঠানো ইলিয়ার একটা তার পেলাম। ছোট্ট করে জানিয়েছে—

আগামীকাল বেলা সাড়ে চারটের সময় নির্দিষ্ট জায়গায় তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকব।

রিজেন্ট পার্কের সেই পুরনো জায়গাতেই আমাদের দেখা হল। যেন একযুগ পরে ওকে দেখলাম।

অনেক কথা জমে ছিল। কিন্তু বলতে গিয়ে যেন বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। মনে হল, ইতিমধ্যে ইলিয়া কি অনেক পাল্টে গেছে? ওর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন শহরে এতদিন কাটিয়ে এসেছে, তার মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন সম্ভব? কিন্তু আমি তো জানি ইলিয়া আমাকে ভালবাসে।

আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ইলিয়াই প্রথম কথা বলল, তোমার সেই স্থপতি বন্ধু যে বাড়িটা তৈরি করেছে বলেছিলে, এবারে আমি সেটা দেখে এসেছি।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে মিঃ স্যানটনিস্ক্রের কথা বলছ?

—হ্যাঁ। আমরা একদিন সেখানে লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলাম।

—এরকম ব্যাপার সম্ভব হল কি করে? বাড়ির মালিক কি তোমার সৎমায়ের পরিচিত?

—ভদ্রলোকের নাম দমিত্রি কনস্ট্যানটাইন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের কারো আলাপ পরিচয় ছিল না। গ্রেটাই কি করে সব ব্যবস্থা করেছিল। ফ্র্যাঙ্ককাকাও সঙ্গে ছিলেন।

—তোমার প্রিয়পাত্রী গ্রেটার কথা তো বললে না। সে-ও নিশ্চয় সঙ্গে ছিল?

—না, গ্রেটা আমাদের সঙ্গে যায়নি। আসলে আমার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা করা—মানে আমার সৎমা ঠিক সুনজরে দেখেন না।

—তাতে আশ্চর্য কি। তাঁর কাছে গ্রেটা তো একজন মাইনে করা কর্মচারীর বেশি নয়। তাছাড়া নিশ্চয় সে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন। বিত্তবানদের পরিবারের একজন হিসেবে গণ্য হবার উপযুক্ত নয়।

—না, মাইনে করা কর্মচারী হলেও আমি তাকে সেভাবে দেখি না। ও আমার বান্ধবী, সহচরী।

—ওসব কথা এখন থাক। তোমার সঙ্গে আমার দরকারী কথাগুলো সেরে নিই।

—বেশ বলো।

—ভদ্রলোকের কাজের সত্যিই তুলনা হয় না। এককথায় অপূর্ব। তিনি যদি আমাদের জন্যও এমন একটা বাড়ি তৈরি করে দিতেন!

বিভারিয়ার বাড়িটার বিস্তারিত বর্ণনা আমি ইলিয়াকে দিয়েছিলাম। গ্রেটার ব্যবস্থাপনায় সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে সেই অপূর্ব সুন্দর বাড়িটা দেখে এসেছে এবং এমন একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখছে।

'আমাদের জন্য' কথাটা বলে তার এই স্বপ্নের সঙ্গে আমাকেও জড়িয়ে নিয়েছে। ইলিয়ার যে মানসিক পরিবর্তন হয়নি বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলাম।

ইলিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল, এতদিন তুমি কি করেছ?

—বরাবর যা করে থাকি তাই করেছি। একটা নতুন কাজ করেছি, আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

—তোমার মায়ের সম্পর্কে তো এতদিন আমাকে কিছু বলনি।

—বলার মতো কি আছে, বল?

—কেন, তোমার মাকে ভালবাস না?

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলাম না। পরে ধীরে ধীরে বললাম, ঠিক বলতে পারব না। মানুষ যখন স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তখন ক্রমেই তো জীবনে পিতামাতার প্রয়োজন কমে আসে। তবে এটুকু বলতে পারি, দুনিয়ায় মাকেই যা আমি একটু ভয় পাই। তাঁর কাছে আমার কোন অপকীর্তিই লুকনো থাকে না। মুখ দেখেই ঠিক বুঝে যান।

ইলিয়া হেসে বলল, একজনকে তো জানতে হবে।

আমি ওর ডানহাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, আচ্ছা ইলিয়া আমার সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান?

—তোমার সবটা জানি বলেই তো বিশ্বাস।

—কিন্তু বিশেষ কিছু তো তোমাকে আমি বলিনি।

—তোমার একান্ত ব্যক্তিগত কথা হয়তো কিছু বলনি। কিন্তু তুমি মানুষটা আমার কাছে লুকনো নেই। তোমার কোনটা পছন্দ কোনটা পছন্দ নয় তা আমি ঠিক বুঝতে পারি।

—আমি যে তোমায় ভালবাসি সেকথাও?

—হ্যাঁ। আমার মনের কথা তোমার কাছেও নিশ্চয় লুকনো ছিল না? তাই নয় কি?

—কিন্তু ইলিয়া, একটা বিষয়ে আমি পরিষ্কার নই। দেখ, লণ্ডন শহরের অতি নগণ্য একটা পাড়ায় আমার মা বাস করেন। আমি কে, কিভাবে জীবনযাপন করি সবই তুমি জান। তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের দুস্তর ব্যবধান। এই পরিস্থিতিতে আমাদের এই সম্পর্কের পরিণতি কি?

—আমাকে কি তুমি একবার তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পার না?

—তা পারি। কিন্তু তা আমি করব না। দয়া করে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না। আসলে আমার ইচ্ছা, দুজন দুজনের জীবনের পরিবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনযাপন করব। সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। নাহলে বাঁচতে পারব না আমরা।

—আমার মনের কথাটাই তুমি বলেছ। আমিও তোমাকে একথাই বলতাম। জিপসি একরে আমরা কেবল আমাদেরই জন্য একটা বাড়ি তৈরি করব।

তোমার স্থপতি বন্ধু মিঃ স্যানটনিক্রই সেই বাড়ি তৈরি করবেন। তবে তার আগে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার।

—হ্যাঁ, আমিও তাই চাই। কিন্তু এর ফলে তোমার কোন অসুবিধা যদি হয়—

—অসুবিধার কিছু নেই। আইনের চোখে আমি এখন সাবালিকা। এখন নিজের খেয়াল খুশিমত চলতে আমার কোন বাধা নেই। ভাবছি, আগামী সপ্তাহেই আমাদের বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে পারব।

তবে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে আমাদের বাস করা হবে না। দুই তরফের কেউই ভালভাবে মেনে নিতে পারবে না।

—তুমি আমাকে কি করতে বলছ?

—বিয়ের কথা আমি আমার আত্মীয় পরিজনদের কিছু বলব না, তুমিও তোমার মাকে কিছু বলবে না। বিয়ে হয়ে যাবার পরে জানাজানি হলে বিশেষ অসুবিধা হবে না। দু চারদিন কিছু হৈ-চৈ হবে এই যা।

একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার বললাম, কিন্তু এদিকে যে জিপসি একরের সম্পত্তিটা বিক্রি হয়ে গেছে।

—সে খবর আমার অজানা নয় মশাই। দু'চোখে হাসির ছটা বিচ্ছুরিত করে বলল ইলিয়া, জিপসি একরের খোদ মালিকই এখন তোমার সামনে বসে রয়েছে।

।। ছয় ।।

সবুজ মাঠের ওপরে কৃত্রিম ঝর্নার পাশে বসে আছি আমরা পাশাপাশি। আশপাশে জোড়ায় জোড়ায় আরো অনেকে বসে আছে। যে যার নিজের স্বপ্ন নিয়েই ব্যস্ত।

এসময় গম্ভীর স্বরে ইলিয়া বলল, মাইক, আজ আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। বক্তব্যটা অবশ্য জিপসি একর বিষয়ে।

আমি বললাম, সম্পত্তিটা কি তুমি তোমার নিজের নামে কিনে নিয়েছ? এতসব করলে কিভাবে, তুমি তো আমাকে তাজ্জব করে দিলে।

—এতে তাজ্জব হবার কি আছে। আমার অ্যাটর্নিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওসব নিয়ে আপাতত তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। এখন আমার কথা শোন।

—শোন ইলিয়া, তোমার অতীত কোন ইতিহাস আমি শুনতে চাই না। আমার কোন আগ্রহ নেই।

—না মাইক, আমি সেকথা বলতে চাইনি। আসলে আমি যেটা বলতে চাইছি, অনেক আগেই তা বলা উচিত ছিল। কিন্তু পাছে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, সেই ভয়ে বলতে পারিনি। মাইক, আমি সত্যিই ধনী।

—তুমিতো আগেই একথা বলেছ।

—কেবল ওইটুকুই বলেছিলাম। কিন্তু ওটুকুই শেষ নয়। আমার ঠাকুরদার কল্যাণেই আমাদের যত বিত্ত সম্পত্তি। খনিজ তেল থেকেই তিনি অগাধ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তেল ছাড়াও নানা ধরনের ব্যবসা ছিল তাঁর।

ঠাকুর্দার তিন ছেলের মধ্যে বাবা ছিলেন বড়। আমার দুই কাকা অবিবাহিত অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলেন। ফলে বাবা একাই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগেই বাবা আমার সৎমায়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলতে গেলে পিতার সমস্ত সম্পত্তি আমিই পেয়েছি।

এই সম্পত্তির পরিমাণ যে কত তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি জান না, আমি এখন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন।

—হায় ভগবান! বিস্ময়ে হতবাক হবার মত অবস্থা আমার, এমনটা সত্যিই আমার ধারণায় ছিল না।

—আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে একথা জানতে দিইনি। আমার নামটা পর্যন্ত গোপন করে গিয়েছিলাম, পাছে তোমার মনে কোন সন্দেহ না দেখা দিতে পারে।

ইলিয়া গুডম্যান হল আমার আসল নাম। মাইক, বাধ্য হয়েই আমাকে এই ছলনার আশ্রয়টুকু নিতে হয়েছিল।

বিত্তবান হতভাগ্য মানুষদের একজন আমি। আমার চারধারে নানান বাধানিষেধের প্রাচীর। পেশাদার গোয়েন্দারা সারাক্ষণ আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখে।

কারুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে সে আমার উপযুক্ত কিনা তা নানাভাবে যাচাই করে নেওয়া হয়।

আমার সেই দুর্বিষহ নিঃসঙ্গ জীবনের কথা তোমাকে সব বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার কাছে তা এক দুঃস্বপ্নের মত।... তোমাকে পেয়ে আমি মুক্তির স্বাদ পেয়েছি।

এখন আমার ইচ্ছে, জিপসি একরেই আমাদের জন্য একটা বাড়ি তৈরি হবে। এই দেখ, কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জিপসি বুড়ির চেহারাটা চোখের ওপরে ভেসে উঠল।

—ওই ছিটেল বুড়ির কথা তুমি মন থেকে মুছে ফেল।

—তবে জায়গাটা যে অভিশপ্ত বুড়ি লী কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

—জিপসিদের স্বভাবই ওরকম। সব সময়েই তারা এমনি ধরনের অলৌকিক অথবা অভিশাপের কাহিনী বলে লোককে চমকে দেবার চেষ্টা করে। মানুষের কুসংস্কারকে উস্কে

banglabooksz.blogspot.com

দেওয়াই ওদের জীবিকা।

—কিন্তু কি জান—

—তবে জিপসি একর সম্পর্কে যদি তোমার মনে কোন দ্বিধা থাকে তাহলে আমরা অনায়াসে অন্য কোনও সুন্দর জায়গায় গিয়ে বাস করতে পারি।

ধর ওয়েলস-এর পাহাড়ী অঞ্চলে কিংবা স্পেনের সমুদ্রোপকূলে স্যানটনিক্স আমাদের মনের মত বাড়ি তৈরি করে দিতে পারেন।

ইলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, তা হবে না, জিপসি একরেই আমরা বাড়ি তৈরি করব। সেখানেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

—হ্যাঁ, সেকথা আমারও হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে।

—তোমাকে বলা হয়নি, আমি তোমার বন্ধু মিঃ স্যানটনিক্সের কাছেও গিয়েছিলাম। দক্ষিণ ফ্রান্সে থাকার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

—ইলিয়া, তুমি দেখছি আজ আমাকে কেবল চমকেই দিচ্ছ। তোমাকে এক নতুন রূপে আবিষ্কার করছি।

—যাই হোক কাজের কথা শোন। ভদ্রলোককে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। জিপসি একরে আমাদের বাড়ি তৈরির পরিকল্পনাটা তাঁকে খুলে জানালাম। তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। কথা দিয়েছেন, টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার কাজ চুকলেই খুব দ্রুত কাজ শুরু করে দেবেন।

আমি বললাম, তুমি দেখছি কেবল দক্ষিণ ফ্রান্স সফরেই যাওনি, আমাদের কাজগুলোও ঠিক ঠিক ভাবে গুছিয়ে ফেলেছ।

—হ্যাঁ, শোন, আগামী মঙ্গলবার দিনটা শুভ, আমাদের বিয়েটা সেই দিনই সেরে নেব ভাবছি।

—কিন্তু, আপাততঃ সেখবর কাউকে জানানো চলবে না।

—শুধু গ্রেটা জানবে। প্রয়োজনীয় সাক্ষীসাবুদ বাইরে থেকেই আমরা জোগাড় করে নেব।

—বেশ তাই হবে।

দ্বিতীয় পর্ব

নীরস, বৈচিত্র্যহীন ভাবেই অবশেষে আমাদের বিয়ে হল। এব্যাপারে গ্রেটা ইলিয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

অত্যন্ত সাবধানে সে ইলিয়ার গতিবিধি সকলের চোখের আড়াল করে রেখেছে।

আমার আশঙ্কা হয়েছিল, আমাদের বিয়েকে কেন্দ্র করে ইলিয়ার আত্মীয়-পরিজন মহলে বেশ বড় ধরনের গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। সে কথা একদিন ইলিয়াকে বলেও ফেললাম।

ইলিয়া একটুও বিচলিত হল না। বলল, সবই দু-চারদিন। একটু হয়তো বকাঝকা করবে, খারাপ ব্যবহারও করতে পারে, তারপর সবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

যথাকালে দেখা গেল ইলিয়ার কথাই সত্যি হল। এবং অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সে সমস্ত কিছু সামাল দিল।

বিয়ের পরে আমরা মধুচন্দ্রিমায় বেরুলাম। প্রথমে গেলাম গ্রীসে, সেখান থেকে ফ্লোরেন্সে, তারপর ভেনিসের লিভোয় গিয়ে কিছুদিন থাকলাম। সেখান থেকে উপস্থিত হলাম ফ্রান্সের বিভিয়েরা। স্যানটনিক্সের সঙ্গেও দেখা করলাম। আমাদের দুজনকে তিনি আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন।

পরে আমাকে বললেন, তোমাদের জন্য একটা বাড়ির প্ল্যান আমি ইতিমধ্যেই তৈরি করে রেখেছি। নিশ্চয়ই তোমার মিসেসের কাছে সব কথা শুনেছো। তোমাদের বিয়ের আগেই তোমার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করে তোমাদের দুজনের জন্য একটা স্বপ্নপুরী তৈরি করবার

আদেশ করেছিলেন।

ইলিয়া সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলল, না না, আদেশ বলবেন না, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম।

স্যানটনিক্র বললেন, তোমরা যে জিপসি একর কিনে নিয়েছ, দিনকতক আগে আমি সেই জায়গাটা ঘুরে দেখে এসেছি। দেখলাম জায়গাটা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এরপর বাড়ির নক্সাটা স্যানটনিক্র আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। জলরঙের একটা ছবিও করা ছিল বাড়ির।

ইলিয়া সব দেখেশুনে উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠল, আমার স্বপ্নের বাড়িটিই যেন আমি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।

স্যানটনিক্র জানালেন খুব শিগগিরই লণ্ডনে এসে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

স্যানটনিক্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এথেন্সে ফিরে এলাম।

ওখান থেকে ইলিয়া কয়েকটা জরুরী চিঠি লিখল। একটা লিখল তার সৎমাকে। আর দুটো ফ্র্যাঙ্ককাকা ও অ্যান্ড্রুকাকার কাছে।

তার এই অ্যান্ড্রুকাকার সম্পর্কে জানতে চাইলে বলল, ইনি তার নিজের কাকা নন, আত্মীয়ের মধ্যেও পড়েন না। আসলে ইনি হচ্ছেন তার আইনসঙ্গত অভিভাবক। বাবাই সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক একজন আইনজীবী।

এখান থেকে আমিও আমার মাকে একটা চিঠি লিখলাম। অবশ্য সত্যিকথা বলতে ইলিয়াই আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

আমি মাকে লিখলাম—

মা,

মনে কেমন একটা সঙ্কোচ ছিল, তাই তোমাকে আগে লেখার সাহস পাইনি। তিন সপ্তাহ আগে আমি বিয়ে করেছি। ব্যাপারটা হঠাৎই হয়ে গেল। এই মেয়েটির কথাই তোমাকে বলেছিলাম। আমার স্ত্রী বেশ সুন্দরী এবং অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। সেইজন্য মাঝে মাঝে বড় অস্বস্তি বোধ হয়।

ভাবছি ফিরে গিয়ে, কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ি তৈরি করব। এখন আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভালোবাসা নিও। —স্নেহের মাইক

লণ্ডনে হোটেল ক্ল্যারিজে আগে থেকেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে রাখা ছিল। লণ্ডনে ফিরে এখানে এসেই উঠলাম আমরা।

স্যানটনিক্রের সঙ্গে কথা বলে নতুন বাড়ির কাজ শুরু করার সব ব্যবস্থাই করে আসা হয়েছিল। তিনি যথাসম্ভব দ্রুত বাড়ির কাজ শেষ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তাই আমরা স্থির করলাম, হোটেল থেকে একবারে নতুন বাড়িতেই গিয়ে উঠব আমরা।

।। দুই ।।

একসময় নতুন নির্মীয়মান বাড়ির কাজ শেষ হল। স্যানটনিক্রের টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা একদিন দেখতে রওনা হলাম।

বেলা শেষ হবার মুখে আমরা জিপসি একরে এসে পৌছলাম। স্যানটনিক্র এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। সদ্য সমাপ্ত হয়েছে বাড়ির কাজ। বাড়ির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম।

এই তো আমার সেই মনের মত বাড়ি, আবাল্য যার স্বপ্ন দেখে এসেছি। এতদিনে তা বাস্তব হয়ে ধরা দিল।

স্যানটনিক্র প্রশ্ন করলেন, বাড়ি পছন্দ হয়েছে?

অভিভূত স্বরে কেবল বলতে পারলাম, এর তুলনা নেই।

—এটাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। অবশ্য এর জন্য তোমাদের অর্থও যোগান দিতে হয়েছে অপরিমিত।

সেইদিনই আমি চিরাচরিত প্রথা মেনে সস্ত্রীক গৃহপ্রবেশ করলাম।

বাড়িতে প্রবেশ করে স্যানটনিক্স আমাকে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলি মাইক, স্ত্রীর প্রতি সর্বদা নজর রাখবে। কখনো স্ত্রীর কোন বিপদ হতে দেবে না।

ইলিয়া বলল, হঠাৎ আপনি আমার বিপদ-আপদের কথা বলছেন কেন?

—কারণ পৃথিবীতে ভাল মানুষ যেমন আছে তেমনি অনেক জঘন্য প্রকৃতির কুৎসিত লোকও ঘুরে বেড়ায়। বাড়িটা তৈরি করতে করতে আমি বুঝতে পেরেছি তোমার চারদিকে জঘন্য প্রকৃতির কিছু লোক সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের দু-একজনের আমি এই জিপসি একরেই দেখা পেয়েছি।

তারা এখানে এসে বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াত। নোংরা ধেড়ে ইঁদুর যা করে তেমনি নাক দিয়ে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করত। সেকারণেই আমার মনে হয়েছে তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

এরপরেই প্রসঙ্গ পাল্টে তিনি বললেন, এবারে এসো, সমস্ত বাড়িটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই।

গোটা বাড়ি আমরা ঘুরে দেখলাম। কয়েকটা ঘর সম্পূর্ণ খালি রয়েছে। বাকি ঘরগুলো উপযুক্ত ও সৌখিন আসবাবপত্র ও ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। দরজা জানলাতেও বেশ মানানসই পর্দা ঝোলানো হয়েছে।

ইলিয়া বলল, বাড়িটার একটা মনের মত নামকরণ করা বাকি রয়ে গেল।

স্যানটনিক্স বললেন, স্থানীয় লোকেরা তো এই এলাকাটাকে জিপসি একর বলে, তাই না?

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, ও নামটা আমার একদম পছন্দ না।

স্যানটনিক্স বললেন, তোমার পছন্দ না হলেও স্থানীয় বাসিন্দারা কিন্তু এলাকাটাকে ওই নামেই ডাকবে।

বাড়ি দেখা শেষ হলে আমরা বৈঠকখানায় এসে বসলাম। গৃহস্থলীর কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় দাসদাসী আগামীকাল এসে পৌঁছবে। আমরা সঙ্গে করেই নৈশ আহারের ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলাম।

তিনটে সুদৃশ্য ডিশে তিনজনের খাবার সাজিয়ে দিল ইলিয়া। খাবারের মধ্যে ছিল, ফরাসী রুটি, গলদা চিংড়ির কারি আর নুন মাখানো শুয়োরের মাংস। প্রচুর পরিমাণে পানীয়ও ছিল সঙ্গে।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নানা বিষয়ের গল্পও চলতে লাগল।

ঠিক সেই সময়েই আচম্বিতে ঘটনাটা ঘটে গেল। বাইরে থেকে একটুকরো পাথর কাচের জানলা ভেদ করে আমাদের খাবার টেবিলে এসে পড়ল।

পাথর লেগে একটা গ্লাস ভেঙ্গে গেল। একটুকরো কাচ ছিটকে ইলিয়ার কপালে এসে লাগল।

এই অভাবিত ঘটনায় আমরা হকচকিয়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম। তারপরই লাফিয়ে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়ালাম।

একটানে ছিটকিনি খুলে জানলা দিয়ে বাইরের চত্বরে গিয়ে পড়লাম। স্যানটনিক্সও আমার অনুসরণ করলেন। আশপাশে খুঁজে কাউকেই পাওয়া গেল না। আমরা উত্তেজিতভাবে ঘরে ফিরে এলাম।

কাচের টুকরো লেগে ইলিয়ার কপাল সামান্য কেটে গিয়েছিল। সামান্য রক্তপাত হয়েছে। কাগজের ন্যাপকিন দিয়ে সযত্নে তা মুছে দিলাম।

ইলিয়া বলল, এমন একটা কাজ কে করতে যাবে? কি উদ্দেশ্যেই বা করবে?

পরিবেশটা হাল্কা করবার জন্য আমি বললাম, বদমাইশ ছেলেছোকরাদের কাণ্ড ছাড়া আর কি হবে। মজা করার জন্যই ওরা এরকম উপদ্রব করে থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা আমি অত সহজ করে নিতে পারছি না। খুবই ভীতিপ্রদ ঠেকছে।

আমি বললাম, স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে আমরা এখনো কিছুই জানি না। কাল সকালে অনুসন্ধান করে দেখা যাবে।

ইলিয়া স্যানটনিক্রের উদ্দেশ্যে বলল, আমরা বড়লোক, অনেক পয়সা খরচ করে বাড়ি করেছি, এরকম ক্ষোভ থেকেই কি কেউ এমন কাণ্ডটা করল? নাকি অন্য কোন কারণ? মিঃ স্যানটনিক্র, জিপসিদের অভিশাপের গল্পটা তো আপনিও শুনেছেন। এখানে যারা বাস করতে আসবে তারাই নাকি সেই অভিশাপের শিকার হবে। তাহলে কি এসব সত্যি?

ইলিয়া যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে স্যানটনিক্র বললেন, আমার মনে হয়, এসব কোন কারণ নয়—

—তাহলে কি কেউ আমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে? আমাদের দুজনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই বাড়ি থেকে?

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, আমাদের এখান থেকে কেউ উৎখাত করতে পারবে না। আমি সবরকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। তোমার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

ইলিয়া পুনরায় স্যানটনিক্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে তো বাড়ির কাজের সময় বেশ কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল। তখন কি কোনভাবে বাড়ি তৈরির কাজে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল?

—বাধা সৃষ্টি হবার মত কিছু ঘটেনি। স্যানটনিক্র বললেন, অতবড় একটা বাড়ি তৈরি হল, সামান্য দু-একটা ঘটনা ঘটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজের সময় মই থেকে পড়ে গিয়ে একজন মজুর চোট পেয়েছিল। আর একজন মজুরের হাত ফস্কে একটা পাথরের বোঝা তার পায়ের ওপর পড়েছিল।

একজনের পায়ের আঙুলে পেরেক ফুটে বিষিয়ে উঠেছিল—এগুলো উল্লেখ করবার মত মারাত্মক কিছু ঘটনা নয়।

—আর কিছু ঘটেনি?

—না ইলিয়া, আমি তোমাকে শপথ করে বলতে পারি। বললেন স্যানটনিক্র।

—আমার কেবলই সেই জিপসি বুড়ির কথা মনে পড়ছে। প্রথম দিনেই দেখা হতে সে আমাদের এখানে আসতে নিষেধ করেছিল। কী সাংঘাতিক ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। ইলিয়া বলল।

—ওই ছিটেল বুড়ির কথা বাদ দাও। বললাম আমি।

—আমরা যেখানে বাড়ি তৈরি করেছি, বিশেষ করে এই জায়গাটা সম্পর্কেই বুড়ি লী আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল। আমরা এখানেই থাকব। কারুর সাধ্য হবে না আমাদের এখান থেকে উৎখাত করে।

বেশ রাগত ভঙ্গিতেই ইলিয়া কথাগুলো বলল।

আমিও তাকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে সুযোগ কেউ পাবে না।

সেদিন এভাবেই আমরা অদৃশ্য নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম।

।। তিন ।।

জিপসি একরের নতুন বাড়িতে এভাবেই আমাদের দুজনের জীবন শুরু হয়েছিল।

বাড়িটার একটা জুতসই নাম খুঁজে পাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম দুজনে।

ইলিয়া মনের সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিল। পরদিন ইলিয়া আমাকে বলল, জায়গাটার নামবদলের চেষ্টা করব না আমরা। জিপসি একর নামই রাখব। সম্পত্তিটা এখন আমাদের। জিপসিরা কবে কি বলেছে না বলেছে তাতে আমাদের কি এসে যায়।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সেদিন আমরা হেঁটে গ্রামের দিকে রওনা হলাম। জিপসি বুড়ির ঝুপড়ির কাছে এসে দেখা গেল তার দরজায় তালা ঝুলছে।

একজন প্রৌঢ়াকে পথে পাওয়া গেল। তাকে জিজ্ঞেস করতে জানাল, অন্য কোথাও গিয়ে

থাকবে। বুড়ি তো মাঝেমাঝেই দু-চার দিনের জন্য এমনি বেপাত্তা হয়ে যায়। জিপসিদের স্বভাবই ওরকম। একজায়গায় বেশিদিন থাকতে পারে না।

বৃদ্ধা জানতে চাইল, পাহাড়ের উঁচুতে নতুন বাড়িটা আপনারাই তো তৈরি করেছেন?

আমি সায় দিয়ে বললাম, সবে গতরাত্রে আমরা এখানে এসে পৌঁচেছি।

—আপনাদের ওই জায়গাটা খুবই সুন্দর। ওই বাড়িটাও সুন্দর। জিপসি একরের চেহারাটাই পাল্টে গেছে। তবে চারপাশটা খুবই নির্জন। অনেকেই আবার অমন গাছপালা ঘেরা জায়গায় বেশিদিন থাকতে চায় না।

—জায়গাটাকে লোকে এত ভয় পায় কেন? ইলিয়া জানতে চাইল।

—তাহলে গল্পটা আপনাদের কানেও পৌঁচেছে। আগে ওখানে যে বাড়িটা ছিল তার নাম ছিল টাওয়ার।

ইলিয়া বলল, আমরা ঠিক করেছি বাড়িটার নাম রাখব জিপসির বাগান।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, বাঃ, এই তো সুন্দর নাম পেয়ে গেছ।

—হ্যাঁ, এইমাত্র মাথায় এল।

সেদিন গ্রামের আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

এরপর জিপসি একরকে ঘিরে আমাদের নানা ধরনের পরিকল্পনা চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে গ্রেটা এসে সাপ্তাহিক ছুটির দুদিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেল। বাড়িটার আসবাবপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। রবিবার বিকেলেই ও চলে গেল।

এই দুদিন ইলিয়া গ্রেটাকে নিয়েই মেতে ছিল। কাছে থাকায় বুঝতে পারলাম, গ্রেটা তার কত প্রিয়। এই অন্তরঙ্গতা আমার অপছন্দ হলেও নিজেকে মার্জিত হাসি ও ব্যবহার দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলাম।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আমাদের কিছুটা আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। অনেকটাই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলাম আমরা।

একদিন বিকেলে মেজর ফিলপট এলেন। ইলিয়াকে ইতিপূর্বেই ফিলপটের পরিচয় জানিয়েছিলাম। স্থানীয় বাসিন্দারা মেজরকে ঈশ্বরের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

ভদ্রলোকের বেশ অমায়িক চেহারা। পোশাকআশাকও অতি সাধারণ। মাথার চুলের বেশিটাই সাদা, বয়স ষাটের কাছাকাছি।

বৈঠকখানা ঘরে এসে নিজেই চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর বেশ অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা শুরু করলেন।

নানান প্রসঙ্গ নিয়েই আমাদের আলোচনা হতে লাগল। কথায় কথায় ইলিয়া একসময় বলল, জিপসিদের অভিশাপের গল্প শুনিয়ে বুড়ি লী তো আমাদের রীতিমত ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। মনে হয় ছিটগ্রস্ত।

—বুড়ি এস্থার এমনিতে বিশেষ উৎপাত করে না। আমিই ওকে কুঁড়েটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। যুবক-যুবতীদের দেখতে পেলে পয়সার লোভে তাদের ভবিষ্যতের কথা শুনিয়ে খুশি করবার চেষ্টা করে।

—কিন্তু আমাদের তো আশাভরসার কোন কথাই শোনাল না। নানানভাবেই সাংঘাতিক ভয় ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ও তো আমাদের এখানে আসতেই নিষেধ করছিল।

মেজর ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অবাক লাগছে। তরুণ-তরুণীদের মনজোগানো কথাবার্তাই তো বুড়ির মুখে সবসময় শোনা যেত। কিন্তু কখনো ওর মুখ থেকে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা তো শোনা যায়নি।

খানিক বিরতির পর মৃদু হেসে মেজর পুনরায় বললেন, আমার ছেলেবেলায় এ অঞ্চলে অনেক জিপসির আস্তানা ছিল। চুরিটুরির অভিযোগ শোনা যেত ওদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এদের আমার খুব ভাল লাগত।

একবার আমার এক ভাই গ্রামের পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল। বুড়ি লী তাকে বাঁচিয়েছিল। এই কারণেই আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ।

এইসময় অসতর্কভাবে ধাক্কা লেগে আচমকা সুদৃশ্য ছাইদানি মেঝেয় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা টুকরোগুলো একজায়গায় জড়ো করলাম।

ইলিয়া বলল, আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি বুড়ি লী আসলে খুবই নিরীহ আর শান্ত প্রকৃতির। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই।

মেজর ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন, ও কি আপনাকে কোন ভয়ের কথা বলেছিল?

আমি বললাম, বুড়ি সেদিন এমনভাবে শাসিয়েছিল যে ভয় পাওয়াটা ইলিয়ার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

—বুড়ি লী—শাসিয়েছিল? অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন মেজর।

বললাম, তার কথাগুলো সেরকমই ছিল। তার পর আমরা যেদিন প্রথম এলাম এখানে, সেদিনই এমন একটা অভাবিত ঘটনা ঘটল যা খুবই ভীতিপ্রদ।

আমি মেজরকে জানালার শার্সি ভাঙার ঘটনাটা খুলে বললাম।

মেজর বললেন, বদমাস ছেলেছোকরাদের কাণ্ড। ব্যাপারটা দেখতে হবে। সত্যিই এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। প্রথম দিনেই—

—তবে তার চাইতেও মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে মাত্র দিনদুয়েক আগে, ইলিয়া বলল।

এই ঘটনাটাও মেজরকে খুলে বললাম। দিনদুয়েক আগে সকালে বেড়িয়ে ফেরার সময় দেখি একটা ছুরিবিদ্ধ মরা পাখি আমাদের দরজার সামনে পড়ে আছে। ছুরির ডগায় গাঁথা একটুকরো কাগজে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ছিল—নিজেদের মঙ্গল চাও তো জিপসি একর ছেড়ে অবিলম্বে চলে যাও।

মেজর ফিলপট রীতিমত রেগে গেলেন ঘটনাটা শুনে। বললেন, সাংঘাতিক কাণ্ড, এতো রীতিমত শাসানো। কোন ছিঁচকে বদমায়েশের কাণ্ড বলে তো মনে হচ্ছে না।

—পুলিসকে তোমরা এঘটনা জানিয়েছিলে?

ইলিয়া বলল, আমরা নতুন এসেছি, প্রথমেই এতদূর যেতে চাইনি। তাতে অপরাধী রেগে গিয়ে হয়তো সাংঘাতিক কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে।

—ব্যাপারটার পেছনে দুরভিসন্ধি রয়েছে। কারুর মনে বিদ্বেষভাব থাকলে এরকম ভাবে শাসানো সম্ভব। কিন্তু—কিন্তু তোমরা তো এখানে নতুন এসেছ—স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয়ই তো হয়নি।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। বিদ্বেষের প্রশ্ন আসবে কেন?

—বেশ, আমি নিজেই ব্যাপারটার খোঁজখবর করব।

তারপর আরও দু-চারটে কথা বলে মেজর বিদায় নিলেন। যাবার আগে আশপাশে নজর বুলিয়ে বললেন, তোমাদের বাড়িটা সত্যিই সুন্দর। ঘরগুলো বেশ বড় বড়—হাওয়া-বাতাস খেলবার উপযুক্ত।

আজকাল তো সব পায়রার খোপের মত ঘর তৈরি হচ্ছে। এটাই নাকি ফ্যাসান। আমার দুচক্ষের বিষ। তোমাদের বাড়িটা খুব দুঁদে স্থপতি তৈরি করেছেন নিশ্চয়?

আমি তাঁকে স্যানটনিক্সের বিষয়ে বলেছিলাম। শুনে মাথা নেড়ে বললেন, স্যানটনিক্স সম্পর্কে একটা আলোচনা তিনি হাউস অ্যাণ্ড গার্ডেন নামক পত্রিকায় দেখেছেন।

বাড়ি ছাড়বার আগে তিনি আমাদের একদিন তাঁর বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন।

নিজের গাড়ি চেপেই এসেছিলেন মেজর ফিলপট। একটা স্প্যানিয়েল কুকুর দেখলাম রয়েছে গাড়ির মধ্যে। গাড়িটা অবশ্য পুরনো।

মেজরের আন্তরিক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। খুব সহজেই তিনি আপন করে

নিতে জানেন। ইলিয়াকে খুবই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তবে আমার সম্পর্কে তাঁর মনোভাবটা বোঝা গেল না। যাই হোক ভদ্রলোককে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা বোঝা গেল স্পষ্ট।

ফিরে এসে দেখি, ইলিয়া ভাঙ্গা অ্যাশট্রের টুকরোগুলো পরিষ্কার করছে। আমাকে দেখে বলল, মেজর খুব সজ্জন ব্যক্তি।

পরের সপ্তাহেই মেজরের বাড়িতে আমাদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ হল। আমাদের সম্মানে আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মেজর সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

স্থানীয় ডাক্তার বৃদ্ধ শ' বেশ সাদাসিদে ধরনের মানুষ। জরুরী একটা কল ছিল বলে সেদিন তিনি লাঞ্চ শেষ হবার আগেই বিদায় নিয়ে নিলেন।

স্থানীয় পল্লীযাজকও উপস্থিত ছিলেন। মাঝবয়সী এক মহিলাও ছিলেন। জানা গেল তাঁর কুকুরের ব্যবসা।

ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল নামে এক সুন্দরী তরুণীও সেদিনের ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। ইলিয়ার সঙ্গে বেশ ভাব জমে গেল তার। ক্লডিয়ার ঘোড়ায় চড়ার শখ। যতক্ষণ ওখানে ছিলাম ইলিয়া তার সঙ্গে ঘোড়া নিয়েই কথা বলে গেল।

মিসেস ফিলপট আমার সম্পর্কে জানতেই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। আমি কি কাজ করি, কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব কথাই তিনি জানতে চাইছিলেন।

এসব বিষয়ে সেই কুকুর-পালিকা মহিলারও দেখলাম সমান উৎসাহ। ভদ্রমহিলার নামটা এখন আর মনে করতে পারছি না।

লাঞ্চের পরে আমি আর ইলিয়া মেজরের বাড়ির বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। সেইসময় ক্লডিয়া এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। কথায় কথায় জানা গেল সে আমাদের মিঃ স্যানটনিক্সের বোন।

ক্লডিয়া বলল, তিনি আমার পিসতুতো দাদা। তবে দেখাসাক্ষাৎ খুব একটা হয় না। আপনাদের বাড়িটা তৈরি হবার সময়।

ইলিয়া স্যানটনিক্সের গুণগ্রাহী। কিন্তু দেখা গেল ক্লডিয়া তার দাদার কাজ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী নয়। তার নাকি পুরনো ধাঁচের ঘরবাড়িই পছন্দ।

ইলিয়া বলল, একদিন আমাদের আধুনিক ফ্যাশানের বাড়িটা দেখে আসবেন। আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

স্থানীয় গলফ্ ক্লাবে ইলিয়াকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিল ক্লডিয়া। বলল, আগে একটা ঘোড়া কিনে নাও।

মেজর তাঁর আস্তাবলটা আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। ক্লডিয়া সম্পর্কে তিনি জানালেন, মেয়েটা খুবই সাহসী। একপাল কুকুর নিয়ে একাই জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু জীবনটাকে কাজে লাগাতে পারল না।

এক আমেরিকান ভদ্রলোককে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এখন সে নিজের পদবীই ব্যবহার করে। আর বিয়েথা' করবে না ঠিক করেছে।

খুব আনন্দের মধ্যেই কাটল সময়টা। একসময় বিদায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম আমরা।

।। চার ।।

বিশ্ব সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা নির্জন জিপসি একরে এসে ঘরসংসার পেতেছিলাম।

দুজনে এখানে একান্তে নিশ্চিন্তে বসবাস করব এই ছি   আশা। কিন্তু অজ্ঞাতবাসের সুখ আমাদের সইল না।

ইলিয়ার সৎমা কোরা দেখা দিলেন মূর্তিমান অভিশাপের মত। একের পর এক চিঠি, শেষের দিকে ঘন ঘন তার পাঠিয়ে উত্যক্ত করতে লাগলেন।

ইলিয়ার নতুন বাড়ি নাকি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি ঠিক করেছেন, ইংলণ্ডেই এরকম একটা বাড়ি করবেন। ইলিয়া যেন জমি বেচাকেনার দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

একদিন সশরীরে আবির্ভাব ঘটল তাঁর। আমাদের এখানে থেকেই জিপসি একরের আশপাশে পছন্দমত জায়গার খোঁজ করে বেড়াতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত কিংসটন বিশপ থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা জায়গা তাঁর পছন্দ হল। যথারীতি এর পরে নতুন জায়গায় বাড়ি তৈরির প্ল্যান ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এরকম একটা ব্যাপার আমাদের মোটেই ভাল লাগবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের আপত্তি জানাবারও কোন উপায় ছিল না।

কয়েকদিন পরে কয়েকটা জরুরী তার এল ইলিয়ার নামে। জানা গেল তার ফ্র্যাঙ্ক পিসে প্রতারণার ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জেলে যেতে বসেছেন। তার সঙ্কট মোচনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

এই সঙ্গে আরও একটা ঝামেলার সংবাদও এসে পৌঁছল। ইলিয়ার ব্যবসা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এইসমস্ত বৈষয়িক ঝামেলা আমার মাথায় ঢুকত না। তাই আমি নাক গলাবারও চেষ্টা করলাম না।

এই সব ঝুটঝামেলার মীমাংসার জন্য ইলিয়াকে ঘন ঘন কিছুদিন ইংলণ্ড যাতায়াত করতে হল।

এরমধ্যেই একটা ব্যাপার আমরা আবিষ্কার করলাম। যে সম্পত্তিটা আমরা কিনেছিলাম সেটা ছাড়াও আশপাশের কিছু জমি ও গোটা পাহাড়ের অনেকখানিই আমাদের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বনজঙ্গলে ঘেরা এই অঞ্চলটা আমরা ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম।

পায়ে চলার কোন পথ এদিকে ছিল না। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছিল আমাদের নিজেদেরই।

বনবাদাড় ঘুরে বেড়াবার সময় একজায়গায় একটা পায়েচলা পথের চিহ্ন খুঁজে পেলাম একদিন। বোঝা যাচ্ছিল দীর্ঘ দিন এই পথ ব্যবহার হয়নি। বহু পরিশ্রম স্বীকার করে পথটার শেষ আমরা খুঁজে বের করলাম। নানা আকার আকৃতির পাথরের চাঙড়ের মাঝখানে ভাঙাচোরা একটা ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা।

ঘন জঙ্গলের ভেতরে লোকজনের সংস্পর্শের বাইরে এমন একটা ঘর আবিষ্কার করতে পেরে বেশ রোমাঞ্চিত হলাম আমরা। যেন একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাওয়া গেল।

দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ঘরটা আমরা লোকজন ডেকে সারাই করিয়ে নিলাম। আশপাশটাও ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে নেওয়া হল।

দিন কয়েকের মধ্যেই নতুন জানালা দরজা লাগিয়ে ঘরটাকে বসবাসযোগ্য করে নেওয়া হল। মাঝে মাঝে এখানে এসে যাতে বিশ্রাম নেওয়া যায় সেইজন্য আসবাবপত্রও নিয়ে আসা হল।

তবে যাতায়াতের পথটা ইচ্ছে করেই পরিষ্কার করালাম না। আমার মনে হল জায়গাটাকে লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে রাখাই ভাল।

সেই সঙ্গে আমি ইলিয়াকে সতর্ক করে দিতেও ভুললাম না। বললাম, তোমার সৎমা কোরাকে কিন্তু ভুলেও এইঘরের সন্ধান দিও না।

কোরা সেই সময়ে দিনকয়েকের জন্য আমাদের এখানেই অবস্থান করছিলেন। সেই কারণেই ইলিয়াকে বিশেষ করে সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল।

কোরা চলে যাবার পর একদিন বিকেলে আমাদের সেই গোপন আস্তানা থেকে ফেরার পথে

একটা দুর্ঘটনা ঘটল। পাথরে পা হড়কে পড়ে গিয়ে ইলিয়ার একটা পা বেশ জখম হল।

পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে আসতে হল। ডাঃ শ'কে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে পরীক্ষা করে জানালেন, হাড় ভাঙেনি, তবে আঘাতটা গুরুতর। অন্তত সপ্তাহ খানেক বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে।

ইলিয়াকে সেবাশুশ্রূষার ব্যাপারে খুবই আতান্তরে পড়ে গেলাম। দাস-দাসীদের দিয়ে সেকাজটা হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইলিয়া গ্রেটাকে দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে তার করেছিল। সংবাদ পাওয়া মাত্র গ্রেটা এসে হাজির হল এবং বাড়ির কাজকর্মের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ইলিয়াও যেন প্রাণ ফিরে পেল।

ইতিমধ্যে দাসদাসীরা ঝামেলা পাকিয়ে বসল। এমন নির্জন জায়গায় তারা থাকতে রাজি হল না। এমন একটা কাণ্ডের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না, কোরা এসেই ওদের বিগড়ে দিয়ে গেছে।

গ্রেটা কিন্তু তোয়াক্কাই করল না। তড়িঘড়ি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সে একদিনের মধ্যেই আর একপ্রস্থ দাসদাসীর ব্যবস্থা করে ফেলল।

গ্রেটার সেবাযত্নে ও তত্ত্বাবধানে ইলিয়া শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠল। তার পরেও কিন্তু গ্রেটা রয়ে গেল।

অবশ্য ইলিয়া আমাকে আড়ালে জানিয়েছিল। গ্রেটা যদি কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকে, কেমন হয়?

আমি সহাস্যে জানিয়েছিলাম, তাহলে তো ভালই হয়। তোমার বন্ধু যতদিন খুশি থাকুন না।

গ্রেটা থেকে গেল এবং ঘরগৃহস্থলীর সমস্ত কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে নিজের হাতে নিয়ে নিল। তার নির্দেশেই এখানকার সব কাজ হতে লাগল।

একদিন লাঞ্চের পরে ইলিয়া বসার ঘরে সোফায় শুয়ে একটা ফ্যাশনের ম্যাগাজিন দেখছিল। বাইরের বারান্দায় মুখোমুখি চেয়ারে বসে আমি আর গ্রেটা গল্প করছিলাম। এই সময় একটা বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ উপস্থিত হল।

সেই থেকে কথাকাটাকাটির সূত্রপাত। কেউ কারুর গোঁ ছাড়ছিলাম না। ফলে উত্তপ্ত কথাবার্তা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে চলে গেল। তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে দুজনেই দুজনকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিলাম।

গ্রেটা যে ক্ষমতাপ্রিয়, ইলিয়াকে সুকৌশলে নিজের কব্জা• :র ফেলেছে এসব কথাও যথেষ্ট তিক্ততার সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিনই প্রথম দেখলাম, সুন্দরী গ্রেটা রেগে গেলে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত অসুস্থ শরীরে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এসে ইলিয়া আমাদের সামাল দিল।

ইলিয়া কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সোফায় নিয়ে ওকে বসিয়ে দেবার পরে বলল, মাইক, তুমি যে মনে মনে গ্রেটাকে এমন ঘৃণা কর আমি আগে ধারণা করতে পারিনি।

ইলিয়াকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, রেগে গেলে আমি হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। মুখ দিয়ে কি বেরয় তা আমি নিজেও জানি না। এ নিয়ে তুমি ভেবো না। আমি গ্রেটার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

শেষ পর্যন্ত গ্রেটার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করেছিলাম। অনেক সাধ্য-সাধনার পর গ্রেটা আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হল।

ডাঃ শ' এসে জানিয়ে দিয়ে গেলেন ইলিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে পারে। তবে উঁচুনিচু পথে হাঁটাচলা করার সময় আহত গোড়ালিটা পুরু কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিতে হবে।

কথায় কথায় ডাক্তারের কাছে আমি জানতে চাইলাম, ইলিয়ার শরীর বা হার্ট সম্পূর্ণ সুস্থ কিনা।

আমার এই প্রশ্নটা করার কারণ হল, একদিন গ্রেটা আমাকে জানিয়েছিল, ইলিয়া ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ডাঃ শ' ইলিয়াকে পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে জানালেন, শরীরে কোনদিক থেকেই ইলিয়ার দুর্বলতার কোন চিহ্ন নেই। সে সম্পূর্ণভাবেই সুস্থ।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ইলিয়াও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, গ্রেটা আমার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে অযথাই উদ্বিগ্ন হয়।

স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ক্রমশই ইলিয়ার বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। বিশেষ করে ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল এখন প্রতিদিনই আমাদের এখানে আসে। ইতিমধ্যে ইলিয়া একটা ঘোড়া কিনেছে। দুজনে মিলে মাঝে মাঝে ঘোড়া চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে আমি ততটা উৎসাহী নই। যদিও আয়ার্ল্যাণ্ডের এক আস্তাবলে কিছুদিন কাজ করেছি আমি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ঘোড়া চড়াটা শিখে নিলে মন্দ হয় না।

ইলিয়া ছোটবেলা থেকেই ঘোড়া চড়ায় অভ্যস্ত। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে বিশেষ আনন্দ পায় ও। গ্রেটাও তাকে এব্যাপারে উৎসাহ যোগায়।

ক্লডিয়ার পরামর্শেই একটা বাদামি রঙের ঘোড়া কিনেছিল ইলিয়া। তার পর থেকে হপ্তায় দু-তিন দিন সে সকালে উঠে ঘোড়া নিয়ে বেরুত।

ঘরগেরস্থালীর কেনাকাটার প্রয়োজন থাকলে গ্রেটা নিজেই গাড়ি নিয়ে মার্কেট কডওয়েল চলে যেত। একদিন দুপুরের খাওয়ার টেবিলে বসে ও বলল, আজ সকালে এক ডাইনীর মত দেখতে বুড়ি আমার পথ আগলে ছিল। ক্রমাগত হর্ন শুনেও রাস্তার মাঝখান থেকে সরছিল না। ফেরার পথেও বুড়ি একই কাণ্ড করল।

আমরা বুঝতে পারলাম জিপসি বুড়ি লীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। ইলিয়া তার পরিচয় জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, বুড়ি তোকে কিছু বলেছিল?

গ্রেটা বলল, কুৎসিত বুড়িটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল।

—কি বলছিল বুড়ি। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—বুড়ি বলছিল, আমরা নাকি জিপসিদের এলাকা জোর করে দখল করে রেখেছি। এখান থেকে চলে না গেলে আমাদের মঙ্গল হবে না।

এখানে নাকি অতৃপ্ত আত্মার অভিশাপ আছে—এখানে বাড়ি তৈরি করে আমরা সেই অভিশাপ কুড়িয়েছি। আমাদের সর্বনাশ হবে।

গ্রেটা সেদিন আরও অনেক কথা বলেছিল। ইলিয়া পরে আমাকে আড়ালে বলেছিল, ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না মাইক।

আমি বললাম, গ্রেটা তো বানিয়ে কিছু বলবার মেয়ে নয়। ও যা বলল, তা তো ভীতিপ্রদ।

হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় এল। ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, পাহাড়ী পথে ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় ইতিমধ্যে জিপসি বুড়ির সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?

ইলিয়া কেমন দ্বিধা করল জবাব দিতে। বুঝতে পেরে বললাম, মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ। জঙ্গলের আড়ালে-আবডালে বুড়িকে দু-একবার আমার চোখে পড়েছে। জঙ্গলের গাছপালার আড়াল থেকে কেউ যেন আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু চিনতে পারি না কে।

একদিন বেশ বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ইলিয়া ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে এল। মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে থরথর করে।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি খুব ভয় পেয়েছ ইলিয়া?

—জান, মাইক, আজ বুড়ি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘোড়া থামালাম। বুড়ি তখন হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আকাশের দিকে তুলে কি সব বকবক করতে লাগল।

মনে হয় অভিশাপ দিচ্ছিল। আমার খুব রাগ হয়ে গেল। বললাম, তুমি কেন আমাদের ভয় দেখাচ্ছ? এ জমি তোমাদের নয়, আমরা কিনে নিয়েছি। বরাবর এখানে বাস করব, সেজন্য বাড়ি তৈরি করেছি।

বুড়ি তেজের সঙ্গে বলল, এ জমি কখনো তোমাদের নয়। এ জমি জিপসিদের। তোমাকে আগেও আমি সাবধান করেছি, আজ শেষবারের মত সাবধান করে দিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার বাঁ কাঁধের পেছনে মৃত্যু থাবা বাড়িয়েছে।

আর দেরি নেই। তুমি যে ঘোড়াটার ওপরে চড়ে আছ, তার একটা পা সাদা। এটা কিসের লক্ষণ জান? মৃত্যু। মৃত্যু। এত সাধ করে জিপসিদের জমিতে যে বাড়ি বানিয়েছ, সেই বাড়িও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে ইলিয়া ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। বারবার তার ঠোঁট শুকিয়ে আসতে লাগল।

গ্রেটাও বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল। আমিও আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

—বুড়ি দেখছি খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। এর একটা সুরাহা করা এখুনি দরকার।

বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুড়ি লীর সঙ্গে আগে কথা বলব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু ঝুপড়িতে তাকে পাওয়া গেল না। সরাসরি চলে এলাম থানায়।

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সার্জেন্ট কীন-এর সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার পরিচয় হয়েছিল। বেশ বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তি। আমার সবকথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

তারপর জানালেন, বুড়ি লীকে নিয়ে আগে কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি। এখন দেখছি, ওকে ডেকে একটু শাসিয়ে দেবার দরকার হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ রজার, বুড়ি আর এমন ব্যবহার করতে সাহস পাবে না।

সার্জেন্ট কীনকে ধন্যবাদ জানিয়ে যখন উঠে আসছি তখন তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব মিঃ রজার। আচ্ছা আপনার বা আপনার স্ত্রীর ওপর কেউ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে, এমন ঘটনা কি কিছু ঘটেছে?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হঠাৎ এমন প্রশ্ন করছেন কেন?

—আমার কাছে একটা খবর আছে, আজকাল বুড়ি বেশ পয়সা-কড়ি খরচ করতে পারছে। কি করে এসব ও করছে, তার কোন হদিস পাইনি।

—ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত ঠেকছে।

—আমার ধারণা, আপনাদের এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে চায় এমন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বুড়িকে টাকা জোগাচ্ছে। এই রকম একটা ব্যাপার বেশ কয়েকবছর আগে এখানে ঘটেছিল। এক ব্যক্তি টাকা দিয়ে বুড়িকে হাত করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল এক প্রতিবেশীকে উৎখাত করা। গ্রামের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজনের মধ্যে বুড়ির উদ্ভট এবং ভয়-দেখানো কথাবার্তা সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। আর বুড়ির মত দরিদ্র লোকজনকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সহজেই বশ করা যায়।

আমি বললাম, আমরা তো এই অঞ্চলে নবাগত। এখনো সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় পর্যন্ত হয়নি।

—ঠিক আছে, আমি দেখছি ব্যাপারটা।

সার্জেন্টের কথায় বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। খুব বিরক্তও লাগছিল। শান্তিভঙ্গের এমন অনাহূত কাণ্ড কেন ঘটছে বুঝতে পারছিলাম না।

গেট দিয়ে ঢুকতেই গীটারের শব্দ কানে এলো। ইলিয়া তার স্প্যানিশ গীটারটা সঙ্গে নিয়ে

এসেছিল। মাঝে মাঝে গীটার বাজিয়ে গুনগুন সুরে গান করতে ভালবাসে ও। গীটারের সঙ্গে সেই গান শুনতেও বেশ ভাল লাগে। ভাবলাম কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করব, এই সময় হাজির হয়ে ওকে বাধা দেব না।

এমন সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল আমার। দেখলাম, কে একজন বাইরে দাঁড়িয়ে বৈঠকখানা ঘরের জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করছে।

কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলাম। আগন্তুক পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। স্বয়ং মিঃ স্যানটনিক্র।

—ওঃ, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম মশায়। অনেকদিন আপনার কোন খবর পাইনি। এখানে কবে এলেন?

স্যানটনিক্র আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। হাত ধরে টেনে নিঃশব্দে জানলা থেকে দূরে সরিয়ে আনলেন আমাকে।

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি মেয়েটাকে এখানে ঢুকতে দিলে কেন? ও কি বরাবরের মতই এখানে এসে উঠেছে?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার কথা বলছেন?

—আমি জানতাম এরকম ঘটনাই একদিন ঘটবে। আমি গ্রেটা মেয়েটার কথা বলছি। তুমি জান, ও কি সাংঘাতিক প্রকৃতির মেয়ে?

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম মিঃ স্যানটনিক্রের মুখের দিকে।

—নিশ্চয় ও বিনা নিমন্ত্রণেই এখানে এসে গেড়ে বসেছে? তুমি কিন্তু সহজে ওকে এখান থেকে নাড়াতে পারবে না।

কোনরকমে বলার চেষ্টা করলাম, ইলিয়া হঠাৎ পা মচকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার সেবাশুশ্রূষার জন্যই দিনকয়েকের জন্য গ্রেটা এখানে এসেছে। ইলিযা এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে, মনে হয় খুব শিগগিরই গ্রেটা নিজের কর্মস্থলে ফিরে যাবে।

—তুমি দেখছি তাহলে কিছুই জান না। ওর উদ্দেশ্য যেনতেন প্রকারে এখানে থাকা। বাড়িটা তৈরি হবার সময়েও বারকয়েক এখানে এসেছিল বলে আমি জানি।

—ইলিয়ার ইচ্ছা, ওর বান্ধবী ওর সঙ্গে এখানেই থাকে।

—মেয়েটা তো শুনেছি, বেশ কিছুদিন থেকেই ইলিয়ার কাছে রয়েছে। ইলিয়ার মত অমন সরলমতি মেয়েকে ধুরন্ধর মেয়েটা খুব সহজেই কব্জা করে নিয়েছে।

কথাটা আমারও অজানা নয়। ইলিয়ার অভিভাবক মিঃ লিপিনকটও গ্রেটা সম্পর্কে একবার ঠিক এরকম মন্তব্যই করেছিলেন।

স্যানটনিক্র ফের বললেন, তোমারও কি ইচ্ছা মেয়েটা বরাবরের মত এখানে থেকে যাক?

আমি বিরক্তির সুরে বললাম, আমি তাকে জোর করে বার করে দিতে পারি না। গ্রেটা আমার স্ত্রীর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আমার এক্ষেত্রে কি বলার থাকতে পারে?

স্যানটনিক্র অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমিও বুঝবার চেষ্টা করছিলাম, তাঁর এমন অদ্ভুত কথার কারণটা কি।

আচমকা তিনি বলে উঠলেন, তুমি বুঝতে পারছ না মাইক, খুব বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়ে চলেছ। বলতে বাধ্য হচ্ছি, গ্রেটাকে নিয়েও তোমার সম্পর্কে আমার সন্দেহ জাগে। কিন্তু মেয়েটার মনোবল তুমি জান না।

এবারে আমি স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ না করে পারলাম না। ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, কীসব আবোলতাবোল বকে চলেছেন আপনি?

—দেখ মাইক, আমি অনেকক্ষণ ধরে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দুজনকে লক্ষ্য করছি। দুজনের ঘনিষ্ঠতা খুবই গাঢ়। এদের মধ্যে তোমাকে একজন বহিরাগত ছাড়া অন্যকিছু মনে হয় না। তুমি কি তা বুঝতে পারছ না?

—এসব কথা আপনি ভাবছেন কি করে? আমি ইলিয়ার স্বামী। এর মধ্যে বহিরাগতের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে?

—আমার বক্তব্য তুমি কোনদিনই বুঝতে পারবে না। যা দেখছি, তুমি তোমার নিজের সম্পর্কেই ঠিক ঠিক ওয়াকিবহাল নও।

এবারে আমি রূঢ় স্বরে বললাম, দেখুন মিঃ স্যানটনিক্স, এটা ঠিক যে আপনি একজন প্রথমশ্রেণীর স্থপতি, কিন্তু তাই বলে—

—তাতে কি কোন সন্দেহ আছে। এই বাড়িটা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রাণমন ঢেলে এটা তৈরি করেছি আমি। তুমি আর ইলিয়া দুজনে মিলে এই বাড়িতে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে এটাই আমি চাই।

আমাকে বলাও হয়েছিল সেরকম। আমার অনুরোধ, তোমাদের মধ্যে তৃতীয় কারুর প্রবেশ ঘটতে দিও না। পরিণতি শুভ হবে না। আমি বলছি, খুব বেশি দেরি হয়ে যাবার আগে ওই মেয়েটাকে তুমি বিদেয় কর।

—দেখুন, গ্রেটাকে আমি নিজেও পছন্দ করি না। কিন্তু সেকথা ইলিয়াকে বোঝানোর উপায় নেই। তবুও, দিনকতক আগেই তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে। কিন্তু তবু এ বাড়ি থেকে তাকে তাড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এর পর খানিক বিরতি দিয়ে আমি পরে বললাম, এখন বুঝতে পারছি, যারা এই জিপসি একর জায়গাটাকে অভিশপ্ত বলে থাকে, তারা খুব একটা মিথ্যা বলে না। এদিকে ঘরে এই অবস্থা, ওদিকে এক জিপসি বুড়ি সেই প্রথম দিন থেকে আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে। কেবলই ভয় দেখায়।

যেন এখান থেকে আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচে। আচমকা বনবাদাড় থেকে সামনে হাজির হয়, বিড়বিড় করে অভিশাপ দেয়।

বলে এখান থেকে চলে না গেলে আমাদের সর্বনাশ হবে। জায়গাটাকে বারাবর পবিত্র এবং সুন্দর রাখা প্রয়োজন।

শেষ বাক্যটা কানে যেতে আমি নিজেও চমকে উঠলাম। কথাটা যেন অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, যেন আমাকে দিয়ে কেউ বলিয়ে নিল বোধ হল।

স্যানটনিক্স ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। সেই রকমই রাখা উচিত। বিশেষতঃ একটা অশুভশক্তির প্রভাব যখন রয়েছে।

—এসব অভিশাপের কথা নিশ্চয় আপনি বিশ্বাস করেন না।

—দেখ মাইক, দুনিয়ার কতটুকু তুমি জান বা দেখেছ? তোমাদের কাছে অদ্ভুত এমন অনেক কিছু আমি বিশ্বাস করি।

এই জাতীয় অশুভশক্তি সম্পর্কেও আমার অভিজ্ঞতা কিছু কম নেই। আমি নিজেও যে খানিকটা অশুভশক্তির অধিকারী, তা কি তোমার মনে হয় না?

আমি বরাবরই আমার মধ্যে অশুভশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি। সেকারণেই কোন অশুভশক্তির কাছাকাছি হলে আমি তা অনুভব করতে পারি। তবে তার উৎসটা সবসময় বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।

একটু থেমে আমার মুখের ওপর সরাসরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, তুমি জান না, এই বাড়িটা তৈরি করার সময় আমি বারবার সতর্ক ছিলাম, কোন অশুভশক্তি যেন একে স্পর্শ করতে না পারে। আমার কাছে এর গুরুত্ব কতখানি, আশাকরি এবারে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?

কথা বলতে বলতে সহসা স্যানটনিক্সের মুখের চেহারা অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল। তিনি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে বকবক না করে চল ভেতরে যাওয়া যাক। ইলিয়ার কাছে গিয়ে বসা যাক।

সেই সন্ধ্যাতেই স্যানটনিক্রের এক নতুন রূপ আমি আবিষ্কার করেছিলাম। তিনি যে কি সাংঘাতিক চরিত্রের মানুষ সে বিষয়ে আগে আমার কোন ধারণা ছিল না।

তাকে আন্তরিকভাবেই ইলিয়া অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তিনিও বেশ খোশমেজাজে আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন। রীতিমত সম্মোহিতের মত গ্রেটার রূপের প্রশংসা করলেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। লক্ষ করলাম গ্রেটাকে যে কোন উপায়ে খুশি করার জন্যই তিনি ব্যস্ত। সারাক্ষণ তাঁর আচারআচরণ লক্ষ্য করে উদ্দেশ্যটা আঁচ করবার চেষ্টা করলাম।

স্বাভাবিক সৌজন্য বশতঃই ইলিয়া স্যানটনিক্রকে দুচারদিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। তিনি জানালেন, মাত্র একবেলার জন্যই এখানে এসেছেন। আগামীকাল সকালেই চলে যাবেন।

।। পাঁচ ।।

পরদিন বিকেলে এক অভাবিত ঘটনা ঘটল। বনপথ ধরে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম। পাইনগাছের তলায় তলায় অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে আসছিল। সহসা চোখে পড়ল, অন্ধকারে গাছতলায় এক দীর্ঘকায় নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

অনুমান করলাম, জিপসি বুড়ি ছাড়া কেউ নয়। ইতিমধ্যে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দুকথা শুনিয়ে দেবার জন্য দু-পা এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু সহসাই স্তম্ভিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আমাকে। দেখি স্থির, নিশ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আমার মা।

—হায় ভগবান, প্রবল বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে? তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? তা বাড়িতে গেলে না কেন?

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে মা আমার সামনে দাঁড়ালেন।

বললেন, তোমার কুশল জানতেই এসেছি আমি। ওই প্রাসাদবাড়িটা কি তোমরা নিজেদের জন্য তৈরি করেছ?

—হ্যাঁ। তোমাকে তো কতবার আসবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। তুমি কোন সাড়াই দিলে না।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বললাম। বিয়ের পর একটা দায়সারা গোছের চিঠির পর মাকে আমি কোন চিঠিই আর লিখিনি।

আমি ভালকরেই জানতাম, মা কোনদিনই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। আর মায়ের আসাটাও আমার অভিপ্রেত ছিল না।

মা বলল, বাড়িটা সত্যিই সুন্দর।

—তুমি নিশ্চয় ভাবছ, আমার মত ছেলের পক্ষে খুবই জমকালো হয়ে গেছে।

—বাছা, এটা সত্যি যে, তুমি যে বাড়িতে ও পরিবেশে মানুষ হয়েছ সেই তুলনায় বাড়িটা জমকালোই বটে। সকলকে সবক্ষেত্রে নিজের সামর্থ্য ও পরিবেশের কথা মনে রেখে চলা উচিত।

—মা, বরাবর দেখেছি, তুমি আমার সবকিছুতেই ভ্রূ কোঁচকাও। আমি একই গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকব চিরকাল তাই কি তুমি চাও? যাকগে ওসব কথা, এখন চল বাড়ির সঙ্গে, তোমার পুত্রবধূকেও দেখবে।

—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছে।

আমি বিস্মিত হলাম মায়ের কথা শুনে। বললাম, তোমার সঙ্গে আবার তার পরিচয় হল কবে?

—তোমাকে তোমার স্ত্রী দেখছি কিছুই বলেনি। সে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য লণ্ডনে গিয়েছিল।

মাকে আমি জানি, ছলচাতুরি, মিথ্যা কখনো প্রশ্রয় দেয় না। তবু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস

না করে পারলাম না, লণ্ডনে গিয়ে ইলিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?

—হ্যাঁ, সপ্তাহ কয়েক আগে হঠাৎ একদিন উপস্থিত হয়েছিল আমার বাসায়। আমি মাইকের মা জানতে পেরে নিজের পরিচয় দিল। বলল, তোমার আপত্তির ফলেই আগে আসতে পারেনি। সেদিনও তোমাকে না জানিয়েই চলে এসেছিল।

তোমার আপত্তি সম্পর্কে মেয়েটি বলল, সে ধনী পরিবারের মেয়ে, অগাধ বিত্তের অধিকারী, সেকারণে তুমি নাকি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাওনি।

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, মাইক তোমাকে ঠিক কথা বলেনি। মাইকের দোষগুলো আমি জানি বলেই সে আমার কাছে আসতে লজ্জা পায়।

আমি ক্ষুণ্নস্বরে বললাম, তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, একথা আমাকে ইলিয়ার বলা উচিত ছিল। কথাটা কি উদ্দেশ্যে গোপন করল, বুঝতে পারছি না।

—উদ্দেশ্য আর কি থাকবে। তোমার অমতে কাজটা করেছে বলে হয়তো পরে বিব্রত বোধ করেছিল।

কথা বলতে বলতে মাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। গোটা বাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাকে দেখালাম। লক্ষ্য করলাম মায়ের ভ্রূ আগাগোড়া কুঞ্চিত হয়ে রইল।

ইলিয়া আর গ্রেটা বৈঠকখানা ঘরে বসেছিল। তাদের দুজনের ওপরে দৃষ্টি পড়তেই মা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

ইলিয়া মাকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করে ব্যস্ত হয়ে উঠে এল। মায়ের দুই হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিল।

—মিসেস রজার, কি সৌভাগ্য, আমি তো ভাবতেই পারিনি।

ইলিয়া গ্রেটাকে ডেকে বলল, ইনি মাইকের মা, আমাদের মাননীয়া অতিথি। আমাদের সংসার স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন।

পরে মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, এ হচ্ছে গ্রেটা অ্যাণ্ডারসন, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মা গ্রেটার দিকে তাকাল। মুহূর্তে তার মুখভাব কঠিন হয়ে গেল।—এ যে দেখছি... এ যে দেখছি... বলতে বলতে মা থেমে গেল।

ইলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছেন—

—না, বলছিলাম, সব কিছুই বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছ তোমরা। সবকিছুই বেশ পরিপাটি, মানানসই।

ইলিয়া গ্রেটাকে মায়ের জন্য চা করতে পাঠিয়েছিল। মা সোফায় এসে বসল।

ইলিয়া মুখোমুখি বসে মাকে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে মালপত্র কোথায়?

মা বললেন, না বাছা, ওসব কিছু আনিনি। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই উঠব। নইলে লণ্ডনের ট্রেন পাব না। তোমাদের কেবল একবার নিজের চোখে দেখতে এলাম।

গ্রেটা চা নিয়ে এসে পৌঁছবার আগেই মা তার সঙ্গে ইলিয়ার দেখা করার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, যে কর্তব্যের খাতিরেই কাজটা সে করেছে। এজন্য আমি যেন ওকে কিছু না বলি।

পরে ইলিয়ার প্রশংসা করে বললেন, এমন সুন্দরী গুণবতী মেয়েকে বিয়ে করা খুবই ভাগ্যের কথা। আমার পুত্রবধূটি প্রকৃতই ভাল মেয়ে।

ইতিমধ্যে গ্রেটা চা নিয়ে এলো। চা খাওয়া শেষ হলে মা আর বসতে চাইলেন না। ইলিয়াও আর বেশি অনুরোধ করল না।

মাকে এগিয়ে দেবার জন্য আমি আর ইলিয়া গেট পর্যন্ত এলাম। বিদায় নেবার আগে মা জানতে চাইল, তোমাদের সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখলাম, সে কে?

গ্রেটার সঙ্গে সম্পর্কের কথা ইলিয়া খুলে জানাল। বলল, ও তিনবছর থেকে এখানে আছে। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। সবরকম ভাবেই ও আমাকে সাহায্য করে।

আরো দু-একটি কথা মা ওর সম্পর্কে জেনে নিলেন। পরে বললেন, দেখ বাছা, বিবাহিত

নারীপুরুষের মাঝে, অন্য কারুর উপস্থিতিটা ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষ করে তোমরা সদ্য বিবাহিত।

মায়ের কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল ইলিয়ার এন্ড্রুকাকা অর্থাৎ মিঃ লিপিনকটের কথা। কথায় কথায় তিনিও একদিন গ্রেটার প্রতি তাঁর বিরাগের মনোভাব আমাকে জানিয়েছিলেন। গ্রেটা নাকি ইলিয়ার ওপর খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

প্রথম দেখার পরে মা-ও সেই একই কথা জানিয়ে গেল। ইলিয়া এ প্রসঙ্গে মাকে কিছু অবশ্য বলল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম।

পরদিন সকাল থেকেই মনটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল। আজ অবশ্য মেজর ফিলপটের সঙ্গে একটা নিলামে যাওয়ার কথা আছে।

জায়গাটা মাইল পনেরো দূরে। কিছু সৌখিন সামগ্রী নিলাম হবে। মেজরেরও এসব বিষয়ে বেশ সখ আছে।

আজকাল ঘোড়ায় চড়াটা ওর নেশার মত হয়ে গেছে। প্রায়ই সকালে বেরিয়ে যায়। ক্লডিয়াও কোন কোন দিন সঙ্গে থাকে। আজও সে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

গ্রেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তাহলে বাড়িতেই আছ তো?

—না একটু বেরুতে হবে। কিছু কেনাকাটার জন্য লণ্ডন যেতে হবে। মার্কেট কডওয়েল স্টেশন থেকে ক্লডিয়াও আমার সঙ্গে যাবে।

ইলিয়াকে বললাম, গ্রেটা যখন লণ্ডনে যাচ্ছে, তুমি তাহলে বার্টিংটনের হোটেলে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দিতে পার।

নিলাম শেষ হবার পরে একটা নাগাদ আমি এবং মেজর ওখানে উপস্থিত হব। মোটর নিয়ে সেখানে যেতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

ইলিয়া সম্মতি জানিয়ে বলল, বেশ তাই হবে। আমি একটা নাগাদ পৌঁছে যাব।

আমি প্রাতঃরাশ সারলাম। এক পেয়ালা কফি আর এক গেলাস কমলার রস পান করে ইলিয়া ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরে কিছুটা এগিয়েই পাহাড়ের মাঝ বরাবর বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। সেই প্রান্তরেই ইলিয়া খুশিমত ঘোড়া নিয়ে ঘোরাঘুরি করে।

রোদ চড়বার আগেই বাড়ি ফিরে আসে।

ইলিয়ার জন্য ছোট গাড়িটা রেখে বড় ক্রাইসলারটা নিয়ে আমি একটু পরেই বার্টিংটন ম্যানরের দিকে রওনা হলাম।

ফিলপট আমার আগেই নিলামঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিলাম শুরু হবার কয়েক মিনিট আগেই আমি তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলাম।

স্থানীয় কিছু লোকজন ছাড়া লণ্ডন থেকেও অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের সঙ্গিনীরাও সঙ্গে ছিলেন।

মেজর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন?

বললাম, নিলামের ব্যাপারে ওর বিশেষ আগ্রহ নেই। তবে, আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দেবে।

প্যাপিয়ে মার্শে অর্থাৎ কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি আসবাব আজকাল বিশেষ দেখা যায় না। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা একটা লেখার টেবিল আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।

ওটা ছিল নিলামের তালিকার বিয়াল্লিশতম দ্রব্য। সেটার যখন ডাক উঠল আমি এগিয়ে গিয়ে দাম দিলাম।

লণ্ডন থেকে আগত দুই ব্যবসায়ীরও এই বস্তুটির বিষয়ে আগ্রহ ছিল। এদের সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে ডাক চলল। শেষ পর্যন্ত বেশ চড়া দামই আমাকে জিনিসটার জন্য গুণে দিতে হল। সেই সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরের জন্য একটা আরামকেদারাও কিনলাম।

জিনিসগুলোকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা জর্জ হোটেলে হাজির হলাম। ইতিমধ্যে আরো অনেকেই সেখানে জড়ো হয়েছেন। হোটেলকর্মীরা রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে।

ভেতরে ইলিয়ার খোঁজ করলাম। ও এখনো এসে পৌঁছয়নি। অবশ্য ঘড়িতে সবে বেলা একটা হয়েছে।

হোটেলের বারে গিয়ে আমরা দু পাত্র পানীয়ের অর্ডার দিলাম। ইলিয়ার জন্য এখানেই অপেক্ষা করা যাক।

চারপাশের প্রায় সব টেবিলেই লোক। হঠাৎ জানালার পাশে বসা এক ব্যক্তিকে দেখে চেনা মনে হল। খুবই পরিচিত মুখ। কিন্তু এই মুহূর্তে সঠিক পরিচয় মনে করতে পারলাম না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মেজরকে বললাম, মনে হয় কোন কারণে আটকে পড়েছে। নইলে এত দেরি হবার কথা নয়। গাড়ির কলকব্জাও বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। বরং চলুন আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই।

মেজর বিশেষ আপত্তি করলেন না। আমরা নির্দিষ্ট টেবিলে গিয়ে বসলাম। মেনু দেখে খাবারের অর্ডার দিলাম।

মেজর বললেন, এই লাঞ্চের ব্যাপারটা ইলিয়া ভুলে যায়নি তো। একটা টেলিফোন বরং করে দেখতে পার।

—ঠিক মনে করেছেন। তাহলে অন্ততঃ মানসিক উদ্বেগটা কমবে।

আমি উঠে কাউন্টারের ফোনটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ফোনটা ধরল আমাদের পরিচারিকা মিসেস কার্সন। সে জানাল, মিসেস রজার তো এখনো বাড়ি ফেরেননি।

—সেকি, ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে—

—হ্যাঁ, সকালবেলা বেরিয়ে যাবার পরে এখনো বাড়িতে ফিরে আসেননি। আমাদের কিছু বলেও যাননি।

খুবই দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। মিসেস কার্সনকে জর্জ হোটেলের ফোন নম্বরটা জানিয়ে বললাম, ইলিয়ার কোন খবর পেলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে।

টেবিলে ফিরে এলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়েই মেজরের চোখেও উদ্বেগের ছায়া পড়ল। আমি বিব্রতকণ্ঠে জানালাম, সেই যে সকালে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে, তার পর এখনও পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। অন্যদিন তো দেড় দু ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসে।

মেজর আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, কোন কারণে কোথাও হয়তো আটকে গিয়ে থাকবে। পাহাড়ি পথে ঘোড়াটা পায়ে চোট পেয়ে থাকলে বেচারীর ভোগান্তির একশেষ হচ্ছে।

হোটেলের বিল মিটিয়ে চিন্তিতভাবে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক তখনই রাস্তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ি স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চালকের আসনে বসে থাকা লোকটির দিকে চোখ পড়ল। এই ভদ্রলোকই হোটেলে জানালার ধারে বসেছিল।

এবারে মনে পড়ে গেল—স্টানফোর্ড লয়েড। ইলিয়ার সম্পত্তির লগ্নিসম্পর্কিত দায়দায়িত্ব তারই ওপর। এখানে ভদ্রলোকের আসার কি কারণ ঘটল মাথায় এলো না।

গাড়িতে বসে থাকা যে মহিলাকে পলকের জন্য নজরে পড়ল, তাকে ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল বলেই আমার মনে হল।

কিন্তু ক্লডিয়ার তো গ্রেটার সঙ্গে লণ্ডনে যাবার কথা। সবকিছু যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

আর অপেক্ষা করা বৃথা মনে হল। মেজরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ফেরার

পথ ধরলাম। মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে পথের লোকজনের কাছে ইলিয়ার খোঁজখবর নিতে লাগলাম। কিন্তু কেউই কোন সন্ধান দিতে পারল না।

জিপসি একরের কাছাকাছি এসে ক্ষেতে কাজ করা একটি লোকের কাছ থেকে জানা গেল, ঘণ্টা দুয়েক আগে সে সওয়ারীবিহীন একটা ঘোড়াকে পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে যেতে দেখেছে।

এরপর আর কোথাও দেরি না করে বাড়িতে ফিরে এলাম। সহিসকে ডেকে ঘোড়া নিয়ে ইলিয়ার খোঁজে পাঠিয়ে দিলাম।

মেজর ফিলটন তাঁর বাড়িতে ফোন করে একজনকে ইলিয়ার খোঁজ নিতে বলেছিলেন। তারপর, ইলিয়া ঘোড়া নিয়ে যে পথে যাতায়াত করে মেজরকে নিয়ে সেই পথ ধরে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হলাম।

বনটা শেষ হলেই বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। বনের ভেতর থেকে কয়েকটা সরু পায়েচলা পথ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে।

এমনি একটা পথের প্রান্তে আসতেই চোখে পড়ল, হাত-পা গুজড়ে পড়ে আছে ইলিয়া। দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলাম।

ফিলপট হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে দেখলেন। পরে উঠে দঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, এখুনি একজন ডাক্তার প্রয়োজন। আমার মনে হচ্ছে—

—ইলিয়া কি মারা গেছে! ভগ্নকণ্ঠে জানতে চাইলাম আমি।

—হ্যাঁ, বিষণ্ন গম্ভীর কণ্ঠ মেজরের, আমার তাই বিশ্বাস।

—হায়, ভগবান। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—এ কি করে সম্ভব।

আমার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল থরথর করে। মেজর এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের সহিস সেখানে এসে পৌঁচেছিল। মেজর তাকে পাঠিয়ে দিলেন ডাঃ শ'কে ডেকে আনার জন্য।

।। ছয় ।।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ শ' তাঁর পুরনো ল্যাণ্ডভারটা নিয়ে এসে পৌঁছলেন। গাড়ি থেকে নেমেই তিনি সোজা ইলিয়ার নিথর দেহটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিসেস রজার মারা গেছেন ঘণ্টা তিনেক আগেই। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কিভাবে?

ডাক্তার শ'কে জানালাম, সকালেই ও ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি।

ডাঃ শ' বলল, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তো মনে করতে পারছি না। আমি অনেকবার তাকে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দেখেছি। খুবই অভ্যস্ত বলে মনে হয়েছে।

আমি বললাম, ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে ওর দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

—তাহলে স্নায়ুর কোন প্রতিক্রিয়াঘটিত ব্যাপার হতে পারে। অথবা ঘোড়াটা কোন কারণে হয়তো চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল।

ইলিয়ার নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে ডাঃ শ বললেন, শরীরে কোন চোট পেয়েছেন বলে বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে না। ভেতরের ব্যাপার বলেই সন্দেহ হচ্ছে। যাই হোক, এখন আমাদের কিছু করার নেই। করোনারের বিচারের সময় পুলিসের রিপোর্ট থেকেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

আমি অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম ডাক্তারের দিকে। তিনি বললেন, আপনি বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করুন।

ইতিমধ্যে কি করে যে খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল কে জানে। কয়েকজন স্থানীয় গ্রামবাসী

এসে সেখানে জড়ো হয়েছিল। তারা নানা কথা বলাবলি করছিল।

একজন বৃদ্ধ চাষীকে বলতে শোনা গেল, আমার সামনে দিয়েই ভদ্রমহিলাকে ঘোড়ায় চেপে যেতে দেখেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়াটাকে একা জোরে জোরে পা ফেলে নেমে আসতে চোখে পড়েছিল।

ডাঃ শ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রমহিলার পাশাপাশি কি আর কাউকে যেতে দেখেছিলে?

—এই হতভাগ্য মহিলা ছাড়া আশপাশে আর কাউকে চোখে পড়েনি। বনের পথ ধরে তিনি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

—সেই জিপসি বুড়ির কাজ নয় তো। একটি মেয়ে এই সময় বলে উঠল।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিপসি বুড়ি? কখন দেখেছ তাকে?

মেয়েটি জানাল, বুড়ির সঙ্গে গ্রামের পথে দেখা হয়েছিল আমার। বেলা তখন আন্দাজ দশটা হবে। আমি নিজ কানে শুনেছিলাম বুড়ি একবার ভদ্রমহিলাকে প্রাণে মারা পড়বে বলে ভয় দেখিয়েছিল।

—তবে কি জিপসির অভিশাপ? আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলাম আমি, জিপসি একরই আমাদের এমন সর্বনাশ করল?

তৃতীয় পর্ব

ইলিয়ার মৃত্যুর পর সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। এমন অভাবিত ঘটনা আমাকে মানসিকভাবে বিবশ করে ফেলল। ফলে পরবর্তী সব ঘটনাই আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে লাগল। অনেক কিছুই ঘটে চলল আমাকে কেন্দ্র করে।

সব ঘটনাই আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাই লিখতে কোন কষ্ট হচ্ছে না।

ইলিয়ার মৃত্যুতে সকলেই আমাকে সমবেদনা জানালেন। আমি বিমূঢ় বিভ্রান্ত। কি করব কি বলব কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না।

গ্রেটাই এগিয়ে এসে আমার হয়ে সবকিছু সামাল দিল। প্রিয় বান্ধবীকে হারিয়ে সে-ও শোকগ্রস্ত। কিন্তু নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে পেরেছিল সে।

খুব দ্রুত ইলিয়ার মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আমি ফিরে এলাম বাড়িতে। আমার সঙ্গে এসেছিলেন ডাক্তার শ'।

তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গেই পরবর্তী কর্তব্যগুলো যেমন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন, তার জন্য লোকজনের ব্যবস্থা, করোনারের বিচার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একসময় বিদায় নিয়েছিলেন।

করোনারের বিচার সভায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে আমার নিজের পরিচয় জানাতে হল। পরে ইলিয়ার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকারের বিবরণ তিনি মনোযোগ সহকারে শুনলেন। জর্জ হোটেলে যে সেদিন আমার সঙ্গে ইলিয়ার লাঞ্চ খাবার কথা ছিল সে-কথাও জানালাম। ইলিয়ার শারীরিক সুস্থতা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়েই আমাকে অনেক রকম প্রশ্ন করা হল।

ডাক্তার শ'-ও সাক্ষ্য দিলেন। ইলিয়ার শরীরে কোন রকম আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কেবল ডান কাঁধের হাড় সামান্য মচকে গিয়েছিল। আর ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার জন্য শরীরে সামান্য কাটা-ছেঁড়ার চিহ্ন ছিল। সবমিলিয়ে এটাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল—ইলিয়ার মৃত্যু হয়েছিল খুবই আকস্মিকভাবে। ডাঃ শ'য়ের মতে, আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই ইলিয়ার মৃত্যু ঘটেছিল।

গ্রেটা তার সাক্ষ্যে জানাল, বছর তিন-চার আগে ইলিয়া একবার গুরুতর হার্টের অসুখে ভুগেছিল বলে সে তার আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনেছিল। সে বেশ জোরের সঙ্গেই জানাল ইলিয়ার

হার্টের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তবে অসুখটা কি ধরনের সেসম্পর্কে সে বিশেষ কিছু বলতে পারল না।

যে সমস্ত গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে জড়ো হয়েছিল, একে একে তাদের সাক্ষ্যও নেওয়া হল। তাদের অনেকেই শেটল গ্রামের মিঃ ক্যারী নামের ঘোড়াটাকে চিনত। তিনিই ছিলেন ইলিয়ার ঘোড়ার প্রাক্তন মালিক।

গ্রামবাসীরা জানাল, ঘোড়াটা ছিল খুবই শান্তশিষ্ট। যে কোন মহিলাই নিশ্চিন্তে তার সওয়ার হতে পারত।

করোনার পুলিসের কাছে জানতে চেয়েছিলেন জিপসি বুড়ি বলে পরিচিত মিসেস লীকে কোর্টে কেন হাজির করা হয়নি।

পুলিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, তার কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। ঝুপড়ির দরজায় তালা ঝুলিয়ে সে কোথায় গেছে, সেকথাও কেউ জানাতে পারেনি। তবে প্রায়ই নাকি সে এভাবে বেপাত্তা হয়ে যায় কিছুদিনের জন্য।

দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকেই নাকি বুড়ির কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না।

বুড়ি লী সম্পর্কে করোনার আমাকেও প্রশ্ন করেছিলেন। সে যে আমার স্ত্রীকে নানাভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করতো, আমি স্পষ্ট ভাবেই সেকথা জানালাম। অথচ আমার স্ত্রীর ওপর তার রেগে যাবার মত কোন ঘটনাই কখনো ঘটেনি।

সাক্ষীসাবুদের কাজ শেষ হলে সেদিনের মত আদালতের কাজ শেষ করে করোনার ঘোষণা করেছিলেন দু-সপ্তাহ পরে আবার শুনানী হবে। ইতিমধ্যে মিসেস লীর সন্ধান করবার জন্য তিনি পুলিসকে নির্দেশ দিলেন।

।। দুই ।।

মেজর ফিলপট অনেক দিন থেকেই জিপসি বুড়িকে জানতেন। গ্রামে তার বসবাসের ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন।

করোনারের বিচারের পরদিন আমি মেজরের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে আমার সন্দেহের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অন্ধ ঘৃণার বশে বুড়ি লী কি এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

মেজর বললেন, ইলিয়ার মত শান্তশিষ্ট মেয়ের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে হলে খুব জোরালো কারণ থাকা উচিত। তুমি নিজেই ভেবে দেখো না, সে-রকম কোন কারণ কি ঘটেছিল?

আমি বললাম, সে-রকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তো আমি অনেক চিন্তা করেও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

অথচ বুড়ি যে মাঝে মাঝেই যাতায়াতের পথে হাজির হয়ে ইলিয়াকে ভয় দেখাতো, তাকে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলতো তার সাক্ষী আমি নিজেই।

ইলিয়া এখানে সম্পূর্ণ নবাগত। তার প্রতি বুড়ির ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ থাকাও সম্ভব নয়।

মেজর বললেন, ব্যাপারটা একারণেই রহস্যময়। এমন একটা রহস্য ঘটনার পেছনে কাজ করছে যার হদিস এখনো আমরা পাইনি।

আচ্ছা, বিয়ের আগে তোমার স্ত্রী কখনো এই অঞ্চলে বাস করতে এসেছিল কিনা সেসম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে?

মেজরের প্রশ্নটা শুনে আমি অকস্মাৎ অদ্ভুতভাবে অট্টহাস্য করে উঠলাম। সেই হাসি আমাকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল। সাময়িকভাবে আমি যেন আমার ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমার এই অস্বাভাবিক আচরণেও মেজরের প্রশান্ত মুখে কোন ভাবান্তর ঘটেনি। তিনি ছিলেন

যথার্থই দয়ালু ব্যক্তি। সহৃদয়তার সঙ্গেই আমাকে বিবেচনা করছিলেন।

সামলে ওঠার পরে আমি মেজরকে বললাম, এই জিপসি একরেই ইলিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

নিলামের নোটিশ থেকে টাওয়ার নামের প্রাচীন সৌধটা বিক্রির কথা জানতে পেরেছিলাম। হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম।

জায়গাটা নিজের চোখে দেখার জন্যই একদিন হাঁটতে হাঁটতে জিপসি একরে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম।

একটা ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার পথে গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল ইলিয়া—তখনই আমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়।

পরে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে আমরা জিপসি একরে নিরিবিলি বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করেছিলাম। আমার মত ইলিয়াও সেই প্রথম জিপসি একরে এসেছিল।

—জায়গাটা যে অভিশপ্ত একথা নিশ্চয় তুমি শুনেছিলে? তুমি সেকথা বিশ্বাস করতে?

—শুনেছিলাম, এখানে পা দেবার আগেই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা আমি নিজেই জানি না। তবে ব্যাপারটাকে একটা অন্ধ কুসংস্কার বলে প্রাণপণে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করতাম।

আমার মানসিক অবস্থার কথা হয়তো ইলিয়া বুঝতে পেরেছিল। একটা আশঙ্কার ছায়া ওর মনেও রেখাপাত করেছিল।

সেকথা, জানতে পেরে, আমার বিশ্বাস, ইচ্ছাকৃতভাবেই কেউ ওকে আতঙ্কিত করে তোলার চেষ্টা করেছিল।

—কে তাকে ভয় দেখাতে পারে বলে তুমি মনে কর?

—একথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে জিপসি বুড়ি মাঝে মাঝেই সুযোগ বুঝে ইলিয়ার পথের ওপরে এসে দাঁড়াত, জিপসি একর ছেড়ে যাবার জন্য তাকে ভয় দেখাত।

মেজর বললেন, তোমার কাছ থেকে এই ঘটনার কথা জানার পর আমি বুড়িকে ডেকে বেশ কড়া করে ধমকেও দিয়েছিলাম।

—কিন্তু বুড়ির এরকম আচরণের পেছনে কারণটা কি হতে পারে. সেসম্পর্কে আপনার ধারণাটা কি?

—দেখ রজার, বুড়িকে আমি খুব ভালভাবে জানি। নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করার একটা ঝোঁক ওর মধ্যে বরাবর কাজ করত। ওর আচার-আচরণের মধ্যে সেই ভাবটা প্রকাশ পেত।

কাউকে অকারণে শঙ্কিত করে তুলে, কাউকে আশার কথা শুনিয়ে, কাউকে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের কথা বলে এমন একটা ভাব প্রমাণ করবার চেষ্টা করত যেন মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সবই সে পরিষ্কার দেখতে পায়।

—শুনেছি বুড়ি নাকি খুবই অর্থলিপ্সু। এমনও তো হতে পারে, কেউ হয়তো টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বুড়িকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে।

আমার কথায় সায় দিয়ে মেজর বললেন, হ্যাঁ, বুড়ির খুব অর্থলালসা ছিল। তোমার আশঙ্কাটাকে একারণেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এরকম সম্ভাবনার কথা তোমার মাথায় এলো কেন?

আমি বললাম, সার্জেন্ট কীন একবার কথা প্রসঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তা থেকেই এই ভাবনাটা আমার মাথায় এসেছে।

—কিন্তু রজার, দ্বিধাগ্রস্তভাবে মাথা নেড়ে মেজর বললেন, বুড়ি এস্থর ভয় দেখানোর ফলে তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বুড়ি হয়তো ভাবতেই পারেনি এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সে হয়তো

ভেবেছিল, পথের মাঝখানে ঘোড়াটাকে আচমকা চমকে দিয়ে খানিকটা মজা করবে। আর একটা ঘোড়াকে অনেক রকম ভাবেই চমকে দেওয়া সম্ভব।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ইলিয়ার ওপরে বুড়ির কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু বিদ্বেষের কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এ জায়গাটা তো ইলিয়ার ছিল না, খরিদ করে দখল নিয়েছিল।

—তা নিয়েছিল। এটাও সত্য কথা এককালে জিপসিদের এ-অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। পছন্দমত ফাঁকা জমি পেলেই ওরা ডেরা বেঁধে বসবাস শুরু করতো। জমির মালিকের অনুমতি নেবার প্রয়োজন বোধ করত না। এখানেও সেভাবেই আস্তানা গেড়েছিল। কিন্তু পরের জমি থেকে উৎখাত হয়ে যে বরাবরের মত কোন রাগ পুষে রাখবে—এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

আমি বললাম, একথা আমিও ভেবে দেখেছি। তবে টাকা দিয়ে বশ করে বুড়িকে লেলিয়ে দেওয়া কষ্টকর বলে মনে হয় না। আমার মনে হচ্ছে এরকমই কিছু ঘটে থাকবে।

মেজর বললেন, কিন্তু কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বুড়িকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বলে তুমি মনে কর?

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম। পরে মেজরকে বললাম, কারণ হিসেবে অনেক সম্ভাবনার কথাই তো মনে করা যেতে পারে।

সার্জেন্ট কীন যে ইঙ্গিতটা করেছিলেন,—এ-অঞ্চল থেকে আমাদের যদি কেউ উৎখাত করতে চায় তাহলে তার পক্ষে ইলিয়াকেই বেছে নেওয়া স্বাভাবিক।

কারণ আমার চেয়ে ইলিয়াকে ভয় পাইয়ে দেওয়া অনেক সহজ। আর আমরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলে জমিটা আবার নিলামে উঠবে। অজ্ঞাতনামা সেই ব্যক্তি হয়তো বিশেষ কোন কারণে জায়গা কিনে নিতে চায়।

—সম্ভাবনাটার পেছনে যুক্তি আছে ঠিকই তবে আমার কাছে কেমন কষ্টকল্পনা মনে হচ্ছে।

—এমনও তো হওয়া অসম্ভব নয়, ধরুন জমিটার নিচে কোন মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। আর এই সংবাদ সেই ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ জানে না। তাছাড়া কোন গুপ্তধন হয়তো পোঁতা আছে।

মেজর ফিলপট কোন মন্তব্য না করে কেবল গম্ভীর ভাবে হুঃ শব্দ উচ্চারণ করলেন।

—অথবা আমি পুনরায় বললাম, এমনও হতে পারে, যে বুড়িকে পরিচালিত করেছে সে হয়তো ইলিয়ারই কোন আত্মপক্ষ।

—সেই শত্রুপক্ষ কে হতে পারে সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই।

—না। কেননা আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এ অঞ্চলের কারুর সঙ্গেই ইলিয়ার পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল না।

এরপর মেজরকে তাঁর সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আবার চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। বললাম, সার্জেন্ট কীনের কাছেই জিনিসটা নিয়ে যাচ্ছিলাম। তদন্তের ব্যাপারে হয়তো তাঁর কাজে লাগতে পারে। আপনাকেও দেখিয়ে নিয়ে যাই।

আমি পকেট থেকে কাগজেমোড়া একটুকরো পাথর বের করে টেবিলের ওপরে রাখলাম।

—এই কাগজ সমেত পাথরটা সকালে প্রাতঃরাশের সময় সার্সি ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল। আমরা যেদিন এখানে প্রথম আসি সেদিনও এমনও ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন অবশ্য পাথরে কাগজ মোড়া ছিল না। কাজটা একই লোকের কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বলতে বলতে পাথরে মোড়া কাগজটা খুলে আমি মেজরের দিকে এগিয়ে দিলাম। কাগজের গায়ে এক লাইনের একটা কথা টাইপ করা ছিল।

মেজর চোখে চশমা লাগিয়ে কাগজটা চোখের ওপর তুলে ধরলেন। পড়লেন ধীরে ধীরে-

যে আপনার স্ত্রীকে খুন করেছে সে একজন স্ত্রীলোক।

মেজরের ভ্রূ জোড়া কুঞ্চিত হল। কপালের রেখায় ভাঁজ পড়ল। চিন্তিতভাবে তিনি বললেন, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার দেখছি।

আচ্ছা, এর আগে মরা পাখির গায়ে বিদ্ধ ছুরির ডগায় লাগানো যে চিরকূটটা তুমি পেয়েছিলে সেটাও কি টাইপ করা ছিল?

বললাম, এখন আমার ঠিক মনে নেই। চিরকূটের বয়ানটাও ভুলে গেছি। তবে এটুকু মনে আছে, আমাদের এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল।

সেটা স্থানীয় কোন গুণ্ডাশ্রেণীর লোকের কাজ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা।

—এটা যে ছুঁড়েছে, বোঝা যাচ্ছে সে বর্তমান দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তাই না?

—ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সেকারণেই সার্জেণ্ট কীনের নজরে আনার কথা ভেবেছি।

চিরকূটটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মেজর বললেন, তুমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ। এব্যাপারে সার্জেণ্ট কীনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

মেজর ফিলটনের কাছ থেকে সরাসরি থানায় চলে এলাম। সার্জেণ্টকেও পাওয়া গেল। ঘটনাটা শুনে তিনিও যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, এতদিনের শান্ত নিরুপদ্রব এই জায়গাতেও বেশ অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে দেখছি।

—এর পেছনের উদ্দেশ্যটা কি বলে মনে হয় আপনার?

—সঠিক বলা কঠিন। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সাহায্যকারীর ছদ্ম পরিচয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবেই সন্দেহটা বিশেষ কারুর দিকে টেনে নিতে চাইছে।

—সেই বিশেষ কেউ কি মিসেস লী?

—না, অত সাদামাটা বলে আমার মনে হয় না। এমন হতে পারে, বড়জোর বুড়ি হয়তো বিশেষ কিছু দেখে বা শুনে থাকতে পারে। কিন্তু চিরকূটের লেখার উদ্দেশ্য জিপসি বুড়ি নয়। কেন না অনেকেই এটা জেনে গেছে যে এই ঘটনার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহের তালিকায় জিপসি বুড়ির নাম রয়েছে। মনে হচ্ছে চিরকূটের পেছনের অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি অন্য কোন মহিলাকে বোঝাতে চাইছে।

আমি জানতে চাইলাম, জিপসি বুড়ির কোন খবর এর মধ্যে পাওয়া গেছে?

সার্জেণ্ট কীন বললেন, জিপসি বুড়ি এখান থেকে কোথায় কোথায় যেত সে সংবাদ আমরা সংগ্রহ করেছি। সাধারণতঃ পূর্ব অ্যাঙ্গোলিয়া বা কাছাকাছি অঞ্চলে যে সব জিপসি আস্তানা আছে, সেখানেই সে যাতায়াত করত।

সেখানে তার পরিচিত অনেকেই বাস করে। তবে সে অঞ্চলের জিপসিরা জানিয়েছে এবারে সে সেখানে যায়নি।

আমরা বিশেষ ভাবে সংবাদ নিয়ে জেনেছি, জিপসি বুড়ির মত দেখতে এমন কাউকেও সে অঞ্চলে দেখা যায়নি আমার ধারণা বুড়ি এবারে অন্য কোন দিকে গেছে।

আমার মনে হল সার্জেণ্ট কীন অন্য কিছু ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। আমি তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বক্তব্য আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হল না।

সার্জেণ্ট সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ঘটনাটা একবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখুন। বুড়ি আপনার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়েছিল, শাসিয়েছিল। এখন এই দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরে তার ওপরে যে সন্দেহটা পড়বে এটা বুড়ি বুঝতে পেরেছে এবং যথেষ্টই ভয় পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুলিস যে তাকে খোঁজ করবে এটা অনুমান করে অজ্ঞাত কোন স্থানে গা-ঢাকা দেওয়া তার

পক্ষে অসম্ভব নয়। পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য যে সে সরকারী যানবাহন এড়িয়ে চলবে সেটাও স্বাভাবিক।

আমি বললাম, আমার বিশ্বাস, বুড়ি আপনাদের চোখে বেশিদিন ধুলো দিয়ে থাকতে পারবে না। বুড়ির চালচলন চেহারার বৈশিষ্ট্য এমন, যে সাধারণ পাঁচজনের মধ্যে থেকে তাকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়।

—তা ঠিক। আজ থেকে, দুদিন পরে হোক, মিসেস লী'র সন্ধান আমরা ঠিক পেয়ে যাব। অবশ্য যদি ঘটনাটা সেরকম হয়ে থাকে।

—তাহলে কি অন্য কোন সম্ভাবনার কথাও...

—হ্যাঁ। গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপরাটা পর্যালোচনা করলে একটা প্রশ্ন উঠে আসে—তা হল, গোপনে টাকা দিয়ে বশ করে বুড়িকে দিয়ে কেউ এসমস্ত কাজ করিয়ে নিয়েছে কিনা।

আমি বললাম, সে ক্ষেত্রে তো বুড়িকে খুঁজে পাওয়াই দুঃসাধ্য হবে।

—তা ঠিক। তবে সেই সঙ্গে আরও একজনেরও যে দুশ্চিন্তা কিছু কম হবে না, সে কথাটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

—বুড়িকে দিয়ে যে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছে, তার কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা...এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটি কি কোন মহিলা হতে পারেন?

—অসম্ভব নয়। আবার এমনও হতে পারে যে মিসেস রজারের মৃত্যু ঘটানো তার অভিপ্রেত ছিল না। হঠাৎ করেই এই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে গেছে। হয়তো সে শুধু চেয়েছিল, জিপসি বুড়িকে দিয়ে বারবার ভয় দেখিয়ে আপনার স্ত্রীকে এখান থেকে বিতাড়িত করবে।

বললাম, সিদ্ধান্তটা অযৌক্তিক নয়। যেভাবে ইলিয়াকে ভয় দেখানো হয়েছে, তাতে একথা সহজেই মনে হয়।

—ঘটনার পরিণতি যা ঘটল তার ফলে অন্তরালের সেই অজ্ঞাতনামা মহিলা সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে। কারণ দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে ভয় পাবে বুড়ি এস্থারও। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য সে আসল ষড়যন্ত্রকারিণীর নামও ফাঁস করেও দিতে পারে।

—তাহলে আপনার বক্তব্য—কোন অজ্ঞাতনামা মহিলাকে আমি অথবা ইলিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছি—

—কেবল নারীর কথাই আমি বলিনি। নারী বা পুরুষ যে কেউই সেই অদৃশ্য চক্রান্তকারী হতে পারে।

আর সে যেই হোক, তার প্রধান উদ্দেশ্য হবে যে কোন প্রকারে হোক বুড়ি এস্থারের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। এই কাজটা সে যত দ্রুত সম্ভব করার চেষ্টা করবে।

—বুড়ি এস্থার মারা গেছে, এমন কোন ইঙ্গিতই কি আপনি করছেন?

ধীরে ধীরে ঘাড় দোলালেন সার্জেন্ট কীন। পরে বললেন, সবই সম্ভব। হঠাৎই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে তিনি বললেন, জঙ্গলের ভেতরে আপনাদের যে নির্জন ঘরটা আছে, সেটা খুবই চমৎকার। আশপাশে যখন আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম, সেই সময় সেটা আমাদের নজরে আসে।

—ঘরটা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়েছিল। আমি আর ইলিয়া সেটা সারিয়ে বাসযোগ্য করে তুলেছিলাম। মাঝে মধ্যে সেখানে গিয়ে আমরা সময় কাটাতাম। অবশ্য হালে বেশ কিছুদিন সেখানে যাওয়া হয়নি।।

—দেখলাম ঘরটা খোলা রয়েছে।

—হ্যাঁ। ওটাতে তালা লাগাবার ব্যবস্থা করিনি আমরা। মূল্যবান জিনিসপত্র তো বিশেষ কিছু নেই।

—আমরা সন্দেহ করেছিলাম, বুড়ি লী হয়তো সেখানেই আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। তবে অন্য একটা জিনিস পেয়েছি।

কথা বলতে বলতে টেবিলের টানা খুলে একটা স্বর্ণখচিত মূল্যবান লাইটার বার করে এনে তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

এ ধরনের লাইটার সাধারণতঃ মেয়েরাই ব্যবহার করে। সোনার জল দিয়ে লাইটারের গায়ে সি অক্ষরটা খোদাই করা।

—এ লাইটার আপনার স্ত্রী নিশ্চয় ব্যবহার করতেন না? জানতে চাইলেন সার্জেন্ট।

—না। তার লাইটারে সি অক্ষর খোদাই করা থাকবে কেন? তাছাড়া, এ জিনিসটা ওর হাতেও কখনো দেখিনি আমি। ইলিয়ার সেক্রেটারী মিস গ্রেটারও নয় এটা।

সি অক্ষরটা আমাদের পরিচিতের মধ্যেকার কারোর নামের আদ্য অক্ষর হতে পারে মনে মনে আমি চিন্তা করলাম। মনে পড়ল ইলিয়ার সৎমা মিসেস কোরার নাম সি দিয়ে শুরু।

কিন্তু ভদ্রমহিলা যে এরকম জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ীপথ ভেঙ্গে এমন একটা জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন এমন সম্ভাবনা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তিনি আমাদের এখানে এসে মাসখানেকের বেশি ছিলেন না।

সেই সময় এ ধরনের কোন লাইটার তাঁকে ব্যবহার করতে আমি দেখিনি। তবে এটা হয়তো অজানা থাকতে পারে।

সার্জেন্টকে আমি সবকথাই খুলে জানালাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। পরে লাইটারটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তাহলে এটা নিয়ে গিয়ে আপনি তাঁকে একবার দেখান।

বললাম, তা দেখানো যেতে পারে। কিন্তু ধরুন যদি সত্যিই লাইটারটা মিসেস কোরার হয়, তাহলে তিনি চলে যাবার পরেও তো আমরা সেই নির্জন ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তো এটা আমাদের কারোর চোখে পড়েনি।

—এটা পাওয়া গেছে কিন্তু ডিভানের কাছে। আমার ধারণা, ঘরটা সময় সুযোগ মত অন্য কেউ ব্যবহার করত। জঙ্গলের মাঝামাঝি অবস্থানে বেশ মনোরম জায়গাটা প্রেমিক-প্রেমিকাদের গোপন অভিসার স্থল হিসেবে একেবারে আদর্শ।

কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এমন দামী লাইটার ব্যবহার করবার মত কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমি বললাম, ইলিয়ার এক বান্ধবীর নাম ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল। আপনিও নিশ্চয় তাকে চেনেন।

কিন্তু ক্লডিয়াও এমন দামী লাইটার ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, ওই জঙ্গলের মধ্যে তো তার যাবার কথা নয়।

—ক্লডিয়ার সঙ্গে কি আপনার স্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল?

—তা ছিল। এই অঞ্চলে ক্লডিয়াই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু। সে যদি কখনো সেখানে যেতে চায়, ক্লডিয়া যে কোন আপত্তি করবে না, তাও সে জানতো। আমি কঠিন দৃষ্টিতে সার্জেন্টের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ক্লডিয়াকে ইলিয়ার শত্রুপক্ষ মনে করা হলে সেটা হবে সম্পূর্ণই এক অবাস্তব কল্পনা।

—হ্যাঁ, আমিও মনে করি না, আপনার স্ত্রীব সঙ্গে ক্লডিয়ার কোনরকম শত্রুতা থাকতে পারে। তাহলেও, বুঝতেই পারছেন, স্ত্রীলোকের মতিগতির কথা কখনোই নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

—শুনেছি, এক আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্লডিয়ার বিয়ে হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম মিঃ লয়েড।

মিঃ স্ট্যানফোর্ড লয়েড নামে আমার স্ত্রীর এক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। অবশ্য দুই লয়েড যে একই ব্যক্তি আমি সেই কথা বলছি না। লয়েড নাম দুনিয়ায় অনেকেরই থাকা সম্ভব।

—আর তা যদি হয়ও, আপনার উল্লেখিত দুই লয়েড একই ব্যক্তি, তাতেই বা কি এসে যায়?

—আমার একটা সন্দেহের কথা আপনাকে জানাচ্ছি। ওই দুর্ঘটনার দিন আমার মনে হচ্ছে

যে মিঃ স্ট্যানফোর্ড লয়েডকে বার্টিংটনের জর্জ হোটেলে লাঞ্চ খেতে দেখেছি।

—অথচ সেদিন তিনি আপনাদের ওখানে যাননি?

—না। তাছাড়া মিঃ লয়েডের গাড়িতে সেদিন এক মহিলাকেও চোখে পড়েছিল। ক্লডিয়ার চেহারার অনেকটাই মিল আছে সেই মহিলার সঙ্গে। অবশ্য আমি দেখেছিলাম রাস্তার অপর ধার থেকে—আমার চোখের ভুলও হতে পারে। তবে আমাদের এই নতুন বাড়িটা যিনি তৈরি করেছেন তিনি ছিলেন ক্লডিয়ারই এক জ্ঞাতিভাই।

সার্জেন্ট কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। পরে বললেন, আচ্ছা, আপনাদের বাড়িটার ওপরে ক্লডিয়ার বিশেষ আগ্রহ আছে, এমন কি কখনো মনে হয়েছে আপনার?

—না—না—তা কেন। ক্লডিয়া তার দাদার তৈরি কোন বাড়িই সুনজরে দেখে না।

এরপর আরো দু-চারটে কথা বলে আমি সার্জেন্টের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। চলে আসার আগে বুড়ি লীর সন্ধান পেলে আমাকে জানাতে অনুরোধ করে এলাম।

থানা থেকে বেরিয়ে এসেই দৈবাৎই দেখা হয়ে গেল ক্লডিয়া হার্ডক্যাসলের সঙ্গে। একেবারে মুখোমুখি।

ক্লডিয়া সবে পোষ্ট অফিস থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সদ্য সদ্য আমি তার সম্পর্কেই সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তখনো পর্যন্ত চিন্তার রেশ মন থেকে মুছে যায়নি।

এই অবস্থায় অভাবিতভাবে চোখের সামনে তাকে দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে গেলাম। ক্লডিয়াও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখে মুখে কেমন বিব্রত, কুণ্ঠিত ভাব।

—ইলিয়ার ব্যাপারটা একেবারেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না মাইক। ওই পরিণতি যে এমন মর্মান্তিক হবে—বুঝতে পারছি এই বেদনাদায়ক বিষয়টা এখন উত্থাপন করা খুবই অস্বস্তিকর, তবু না বলে তো পারছি না—

—সবই বুঝতে পারি ক্লডিয়া। এই নির্জন গ্রামে তুমিই ছিলে তার একমাত্র বন্ধু। তুমি তাকে এমন আপন করে নিয়েছিলে যে গ্রামটাকে সে সহজেই নিজের বলে মনে করতে পেরেছিল। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ক্লডিয়া এর পরে ঘনিষ্ঠভঙ্গিতে বলল, তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলব ভেবেছিলাম।

আমি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, অসুবিধা কি আছে—স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

—শুনলাম তুমি নাকি শিগগিরই আমেরিকা যাচ্ছ?

—হ্যাঁ। খুব শিগগিরই একবার যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তোমার কথা...

—হ্যাঁ বলছি। তুমি যদি এই বাড়িটা বিক্রি করে দেবার কথা চিন্তা করে থাকো, তাহলে তোমার আমেরিকা রওনা হবার আগেই এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা যেতে পারে।

স্তম্ভিত আহত দৃষ্টিতে ক্লডিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমন একটা প্রস্তাব ওর মত মেয়ের কাছ থেকে আসতে পারে, এ আমার কল্পনাতেও ছিল না।

সংযত কণ্ঠে বললাম, বাড়িটা তুমি কিনতে চাও? কিন্তু আমি তো জানতাম এধরনের আধুনিক বাড়িঘর তোমার অপছন্দ।

—হ্যাঁ, কথাটা আমি বলেছিলাম বটে। কিন্তু দাদা রুডলফের মুখে শুনেছি, ওটাই নাকি তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বাড়িটার জন্য যে অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে তা আমি আন্দাজ করতে পারি। সব দিক ভাবনাচিন্তা করেই কথাটা তোমাকে বললাম।

ব্যাপারটা কেবল অস্বস্তিকর নয় অস্বাভাবিকও মনে হল আমার। ইতিপূর্বে অনেকবারই ক্লডিয়া আমাদের বাড়িতে গেছে। তার কথাবার্তা হাবভাবে কখনো প্রকাশ পায়নি, বাড়িটার প্রতি তার কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে।

তাছাড়া ক্লডিয়ার দাদা স্যানটনিক্সের শিল্পীসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বাড়িটার প্রতি যে সে আকর্ষণ বোধ করবে তেমনও নয়। স্যানটনিক্স সম্পর্কে যে সব মন্তব্য সে করেছে তাতে তার প্রতি

বিরূপ মনোভাবই বরাবর প্রকাশ পেয়েছে। কি জানি হয়তো আমার ধারণায় হয়তো ভুল ছিল।

আমি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললাম, আমি যে বাড়িটা বিক্রি করতে চাই এমন ধারণা তোমার হল কি করে ক্লডিয়া? এ জায়গাটা ইলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত। এ জায়গা ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যাব না।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক ঠেলে। পরে আবার বললাম, জিপসি একরকে আমরা দুজনেই ভাল বেসেছিলাম, এখানে বাস করব বলে এসেছিলাম।

তার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে আমি এখানেই পড়ে থাকতে চাই। জায়গা বিক্রি করার কথা যেন ভুলেও আমার মনে উদয় না হয়।

ক্লডিয়া নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমারও আর কোন কথা বলার প্রবৃত্তি হল না।

কিন্তু হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই আমাকে কথা বলার শক্তি সঞ্চয় করতে হল।

ধীরে ধীরে বললাম, কিছু যদি মনে না কর, একটা প্রশ্ন করব। নেহাৎই ব্যক্তিগত প্রশ্ন, জবাব দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছা।

ক্লডিয়া গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বললাম, তোমার সঙ্গে যেই আমেরিকান ভদ্রলোকের বিবাহ হয়েছিল তার নাম কি স্ট্যানফোর্ড লয়েড?

নির্বাক ক্লডিয়া কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আঁচ করবার চেষ্টা করল সম্ভবতঃ। পরে হঠাৎই হ্যাঁ, বলে মাথা নেড়ে ধীর পায়ে আমার সামনে থেকে সরে গেল। আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার সুযোগ দিল না।

।। তিন ।।

আমাদের ধারণা ছিল ইলিয়ার আত্মীয় স্বজন সকলেই আমেরিকা ফিরে গেছে। কিন্তু পরে অবাক হয়ে জানলাম, তারা প্রায় সকলেই বর্তমানে ইংলণ্ডে উপস্থিত।

মিসেস কোরা অবশ্য এমনিতেই সর্বক্ষণ চরকির মত দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কথা আলাদা।

তবুও চমৎকৃত না হয়ে পারলাম না যখন শুনতে পেলাম, ইলিয়ার মৃত্যুর দিন কোরা এই পাহাড়ী গ্রামের পাশেই ছিল। ঘটনার মাত্র দুদিন আগে সে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছে।

কোরার সঙ্গে একই প্লেনে স্ট্যানফোর্ড লয়েডও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমেরিকা থেকে লণ্ডনে হাজির হয়েছে। এরা দুজনেই দুঃসংবাদটা জানতে পারে দৈনিক সংবাদপত্রের সান্ধ্য সংস্করণের খবর পড়ার পরে।

যাই হোক, একটা বিরাট হৈ চৈ, আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যেতে হয়েছিল আমাকে। সাংবাদিকরা ঝাঁক বেঁধে এসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে, সাক্ষাৎকার চাইছে। ওদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য চিঠি আসছে, তার আসছে, দর্শনার্থীর সংখ্যাও নগণ্য নয়।

অবাক হলাম দেখে গ্রেটা একা হাতেই আশ্চর্য নিপুণতায় সবদিক সামাল দিচ্ছে। আমাকে খুব একটা বিব্রত হতে হয়নি।

একটা বিশ্রী অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, ইলিয়াকে কোথায় সমাহিত করা হবে সেই ব্যাপার নিয়ে। আমার ধারণা ছিল জিপসি একরেই তার অন্তিম শয়নের ব্যবস্থা করা হবে। কেন না, এই জায়গাটাকে ভালবেসে আমরা দুজনেই এখানে বাস করতে এসেছিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ইলিয়ার আত্মীয়স্বজন ইলিয়ার মৃতদেহ আমেরিকায় নিয়ে যাবারই পক্ষপাতী। তার পূর্বপুরুষদের যেখানে সমাহিত করা হয়েছে, সেখানে তারও সমাধি রচনা করা হবে।

আপত্তি করার বিশেষ কারণ ছিল না বলে আমি এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দায়িত্ব আত্মীয়

স্বজনের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ইলিয়ার এনড্রুকাকা অর্থাৎ মিঃ লিপিনকট একসময় আমাকে জানিয়েছিলেন, ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরী কিছু কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য আমাকেও এই সময় একবার আমেরিকা যেতে হবে।

এসব ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকতো না। তাই কখনো মাথা ঘামাবার চেষ্টা করতাম না। ইলিয়া নিজেই সব সামলাত। তাই বললাম, ওসব ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো কোনকালে ছিল না।

লিপিনকট বললেন, আগে না থাকলেও এখন বর্তেছে। তুমি নিশ্চয়ই জান, ইলিয়ার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির তুমিই এখন একমাত্র উত্তরাধিকারী। ইলিয়া সেরকমই উইল করে গেছে।

—এরকম কোন উইল যে ইলিয়া করেছে তা আমি জানি না।

লিপিনকট বললেন, হ্যাঁ সে উইল করে গেছে। তোমাদের বিয়ের কিছুদিন পরেই পাকা বৈষয়িক মানুষের মত সে একটা উইল করে।

লণ্ডনের আইনজীবীদের কাছে সে উইলটা জমা রাখা আছে। ইলিয়ার ইচ্ছানুসারেই উইলের একটা কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমি লিপিনকটের মুখের দিকে তাকালাম। এই ঝানু আইনজ্ঞ লোকটিকে আমার ভীষণ ভয়। সবসময় তার সব কথার অর্থ বুঝে ওঠা যায় না। মুখ দেখে ভদ্রলোকের মনোভাব আঁচ করা দুঃসাধ্য।

লিপিনকট সামান্য ইতস্ততঃ করে বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার একবার আমেরিকা যাওয়া প্রয়োজন বলেই আমি মনে করি। বিষয় সম্পত্তি এখন তোমার, এসব দেখাশোনার দায়দায়িত্ব তুমি তোমার পছন্দমত সেখানকার কোন আইনজ্ঞের হাতে তুলে দিয়ে আসতে পার।

—তার কি প্রয়োজন?

—কারণ, বিশাল সম্পত্তির দায়দায়িত্ব কিছু কম নয়। সবকিছু ঠিকভাবে তদারকি করতে হলে তোমাকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ মেনেই চলতে হবে।

—কিন্তু এসব তো আমি কিছুই বুঝি না। অকপটে স্বীকার করলাম আমি।

সহানুভূতির সুরে লিপিনকট শান্তভাবে বললেন, তোমার অবস্থাটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি।

—ইলিয়ার বর্তমানে যেমন ছিল, এখনও তো আপনিই সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

—তা অবশ্য পারি।

—তাহলে অন্য কাউকে এর মধ্যে জড়াতে যাব কেন?

—বলছি একারণে যে, ইলিয়ার পরিবারের আরো কয়েকজনের দায়িত্ব ইতিপূর্বেই আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তাদের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তা আমার দেখা কর্তব্য। অবশ্য তুমি যদি আমাকেই দায়িত্ব দিতে চাও তাহলে তোমার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থাও আমাকে যথাযথ ভাবে করতে হবে।

আমি লিপিনকটকে বারবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বললাম, আপনি সত্যিই দয়ালু।

—তাহলে তোমাকে কয়েকটা পরামর্শ আমার এখুনি দেওয়া উচিত।

আমি সবিনয়ে বললাম, বলুন।

—সইসাবুদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবে। বিশেষতঃ ব্যবসা সংক্রান্ত কোন নথিপত্রে। ভাল করে খুঁটিয়ে না দেখে কোথাও কোন সই করবে না।

—কিন্তু এসব বৈষয়িক নথিপত্র কি একবার দুবার পড়েই আমি বুঝতে পারব?

—বুঝতে কোথাও অসুবিধা বোধ করলে, সই করবার আগে তোমার আইনজ্ঞের পরামর্শ নেবে।

আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, বিশেষ কারুর সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যেই কি আপনি আমাকে এই কথা বলছেন?

—তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলেই আমি মনে করি, আমার কথা বুঝতে পারবে। তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়।

তবে এটুকু বলতে পারি, যেখানে অর্থকড়ির প্রশ্ন জড়িত, সেখানে কাউকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয়।

লিপিনকট নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তির নাম না করলেও তিনি যে বিশেষ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দিতে চাইছেন, তা [illegible] আমার কষ্ট হল না। সেই বিশেষ ব্যক্তিটি কোরা কিংবা স্ট্যানফোর্ড অথবা ইলিয়ার ক্রাঙ্কপি[illegible] বিচিত্র নয়—আমি চিন্তা করলাম।

সব দেখেশুনে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন চারপাশে শ্বাপদ বেষ্টিত হয়ে পড়েছি। যে কোন মুহূর্তে এরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

লিপিনকট আমার মনের কথাটাই যেন উচ্চারণ করলেন, এই পৃথিবীটা খুব একটা ভাল জায়গা নয় মোটে।

আমি জানতে চাইলাম, ইলিয়ার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে আমি ছাড়া আর কেউ কি লাভবান হচ্ছে ?

লিপিনকট আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন তোমার মনে উদয় হল কেন বলতো ?

বললাম, কোন কারণ নেই। হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হল, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম।

লিপিনকট কয়েকমুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর বললেন, ইলিয়া তার উইলে অনেককেই অনেক কিছু দিয়ে গেছে। মিস অ্যাণ্ডারসনের কথাও সে ভোলেনি। তবে তার সঙ্গে যে দেনাপাওনার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেছিল বেশ মোটা অঙ্কের চেকের মাধ্যমে, তা তুমি হয়তো জানো।

—হ্যাঁ, ইলিয়া নিজেই আমাকে বলেছে।

—ইলিয়ার নিকট আত্মীয় বলতে একমাত্র তুমিই নিশ্চয় তুমি আমাকে একথা বলতে চাও নি ?

—আমি কিছু বোঝাবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু মিঃ লিপিনকট, আপনিই কিন্তু আমার মনটাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলছেন। কাকে সন্দেহ করব, কেন সন্দেহ করব না, এসব কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

—সেটাই স্বাভাবিক। তবে কারুর মৃত্যু ঘটলে, সেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একটা হিসেব নিকেশের প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি যে সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায় এমন নয়, অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে তার জের চলতে থাকে।

—আপনি কি ইলিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে ইঙ্গিত করতে চাইছেন ? এব্যাপারেও কি কোন অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ?

—না তেমন কোন আশঙ্কা আমি করছি না। তবে ইলিয়ার অকাল মৃত্যুর বিষয়ে কারুর মনে প্রশ্ন জাগাটাও অস্বাভাবিক নয়।

ইলিয়ার মৃত্যুতে কেউ না কেউ তো নিশ্চয় লাভবান হবে। এখন সে যদি খুবই সাধারণ কেউ হয় তাহলে তার দিকে সহজে কারুর নজর পড়বে না। সেক্ষেত্রে নিজের অপকর্মের চিহ্ন প্রমাণ খুব সহজেই সে লোপাট করে দেবার সুযোগ পাবে।

একটু থেমে পরে বললেন, তুমি তোমার নিজের কথাই এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে ধরতে পার। তবে এ বিষয়ে আর কোনরকম আলোচনা না করাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। নিরপেক্ষতা রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

ইলিয়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করা হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে স্থানীয় একটা গীর্জায়। আমার দূরে সরে থাকবার উপায় ছিল না।

গীর্জার বাইরে যারা সমবেত হয়েছিল, তাদের অনেকেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। গ্রেটাই আমাকে সারাক্ষণ আগলে রাখল। তার ব্যবস্থাপনাতেই সমস্ত

ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল।

এখানকার সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে গ্রেটাকে আমি নতুন ভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ পেলাম। তার মত করিৎকর্মা মেয়ে খুব কমই আমার চোখে পড়েছে। বুঝতে পারছি এই কারণেই ইলিয়া তার ওপরে এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

গীর্জায় উপস্থিত হয়েছিল আমাদের প্রতিবেশীদের প্রায় সকলেই। সকলকে আমি চিনি না। তবে একজনকে দেখে মুখটা খুব পরিচিত বলে মনে হল। তবে কোথায় দেখেছি স্মরণে আনতে পারলাম না।

একসময় ক্লান্ত অবসন্ন মনে বাড়িতে ফিরে এলাম। একটু পরেই পরিচারক কার্সন এসে জানাল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কে একজন বৈঠকখানা ঘরে বসে আছে।

খুবই বিরক্ত হলাম। বললাম, আজ কারুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয় জানিয়ে দাও। আর অচেনা কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

কার্সন সবিনয়ে জানাল, ভদ্রলোক নাকি বলেছেন তিনি আমার আত্মীয়। একটা কার্ড আমার হাতে দিল। উইলিয়াম আর পার্ডো—নামটা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। এরকম নামের কাউকে চিনি বলেও মনে হল না। অগত্যা কার্ডটা গ্রেটাকে দিলাম।

গ্রেটা একপলক দেখেই চিনতে পারল। বলল, হ্যাঁ, ভদ্রলোককে চিনি। ইলিয়ার জ্ঞাতিভাই। ইলিয়া তাকে রুবেন কাকা বলে ডাকতো।

এতক্ষণে মনে পড়ল, গীর্জায় সমবেত লোকজনের মধ্যে কেন একজনকে আমার চেনা মনে হয়েছিল। ইলিয়ার বসার ঘরে তার আত্মীয় পরিজনের একটা গ্রুপ ফোটো টাঙানো ছিল। মিঃ পার্ডোর ছবিও ছিল তার মধ্যে।

বাধ্য হয়েই খবর পাঠিয়ে দিয়ে মিনিট দুয়েক পরে আমাকে বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত হতে হল। মিঃ পার্ডো উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সুপ্রভাত জানালেন।

—তুমি নিশ্চয় মাইকেল রজার। আমি হচ্ছি ইলিয়ার জ্ঞাতিভাই। বয়সে অনেক বড় বলে ও আমাকে রুবেনকাকা বলে ডাকত। আমার কথা নিশ্চয় তুমি ইলিয়ার মুখে শুনে থাকবে। এই প্রথম আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় হল।

—সাক্ষাৎ না হলেও আপনাকে চিনতে অসুবিধে হয়নি আমার।

—এমন অকালে ইলিয়াকে আমরা হারাব স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কতটা যে আঘাত লেগেছে আমার তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, আপাততঃ এই প্রসঙ্গ না উঠলেই আমি স্বস্তি পাব।

—হ্যাঁ, আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পারি।

ভদ্রলোক আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা পড়ল কফির সরঞ্জাম নিয়ে গ্রেটা ঘরে ঢোকায়। আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সুযোগ পেলাম।

—মিস অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে নিশ্চয় আপনার পরিচয় আছে?

—নিশ্চয়ই। গ্রেটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, কেমন আছো গ্রেটা?

—খুব একটা খারাপ নেই। আপনি কতদিন দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন?

—হপ্তা দুয়েক হবে। শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে এসে পৌঁচেছি।

হঠাৎ করেই একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, দিন কতক আগে আপনাকে আমি দেখেছি।

পার্ডো আমার দিকে ফিরে বললেন, কোথায় দেখেছ?

—বার্টিংটন ম্যানরের এক নিলাম ঘরে।

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমাকেও সেদিন আমার চোখে পড়েছিল। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে ছিলেন।

—হ্যাঁ, মেজর ফিলপট।

—তোমরা দুজনেই মনে হল খুব খোশমেজাজে ছিলে।

—তা ঠিক।

—তোমরা নিশ্চয়ই তখনো দুর্ঘটনার কথা কিছুই জানতে না। সেদিনই তো দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, তাই না?

—হ্যাঁ। আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দেবার কথা ছিল ইলিয়ার। তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

—সত্যিই ভাবতে পারছি না ঘটনাটা।

—আপনিও যে সেসময় লণ্ডনে থাকতে পারেন এমন সম্ভাবনা আমার মনে উদয় হয়নি।

—জানবে কি করে, ইলিয়াকে আমি কোন চিঠিপত্র দিইনি। ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাজে হঠাৎ করে চলে আসতে হয়েছিল।

কতদিন ইংলণ্ডে থাকতে হবে নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু কাজটা চটপট মিটে গিয়েছিল বলে সেদিন নিলামে উপস্থিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

ইচ্ছে ছিল নিলাম শেষ হলে তোমাদের এখানে ঘুরে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি।

—নিজের ব্যবসার কাজেই কি আপনি ইংলণ্ডে এসেছিলেন?

—অনেকটা সেরকমই। কোরাই আমাকে একটা জরুরী তার পাঠিয়েছিল। ইংলণ্ডে নাকি একটা বাড়ি কিনবে মনস্থ করেছে, তাই আমার পরামর্শ চায়।

কোরার ইংলণ্ডে উপস্থিতির কথা সেদিন মিঃ পার্ডোর কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারলাম। সেকথা ভদ্রলোককে জানাতেও দ্বিধা করলাম না।

—কোরা সেদিন এই অঞ্চলেই ছিল।

—এই অঞ্চলে? বিস্মিত হলাম আমি, তিনি কি কোন হোটেলে উঠেছিলেন?

—না, তার এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিল।

—বন্ধুর বাড়ি... কিন্তু এখানে তাঁর কোন বন্ধু আছে বলে তো আগে কখনো শুনিনি।

—হ্যাঁ আছে, ভদ্রমহিলার নাম... হ্যাঁ মনে পড়েছে মিসেস হার্ডক্যাসল।

—ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল? আমি হতচকিত হলাম শুনে।

—হ্যাঁ। কোরার অনেক দিনের বন্ধু। মহিলা অনেকদিন আমেরিকায় ছিলেন, তখনই দুজনের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু তুমি কি এখবর জানতে না?

গ্রেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ক্লডিয়ার সঙ্গে মিসেস কোরার বন্ধুত্বের বিষয়ে তুমি কি কিছু জানতে?

—ওহ্ না। আমি তাঁর মুখে কখনো মিসেস হার্ডক্যাসলের নাম শুনিনি। ক্লডিয়া সেদিন কেন যে আমার সঙ্গে লণ্ডনে যায়নি এখন বুঝতে পারছি।

—সে কি! কডওয়েল স্টেশনে তো তোমাদের দুজনের দেখা হবার কথা ছিল। ঠিক ছিল সেখান থেকে লণ্ডনে গিয়ে কি সব কেনাকাটা করবে?

—হ্যাঁ। কিন্তু ক্লডিয়া যেতে পারেনি। তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল হঠাৎ ওর এক বন্ধু আমেরিকা থেকে এসে পড়েছে বলে বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে না।

—আমেরিকার সেই বন্ধু নিশ্চয়ই মিসেস কোরা?

—নিশ্চয়ই, মিঃ পার্ডো বললেন, সবই দেখছি কেমন গোলমেলে। ওদিকে করোনারের বিচারও নাকি কিছুদিনের জন্য মুলতবী রাখা হয়েছে।

এরপর আর আমাদের বেশি কথা হল না। কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে মিঃ পার্ডো বললেন, আজকের মত ওঠা যাক। আমি মার্কেট কডওয়েলের ম্যাজেস্টিক হোটেলে উঠেছি। যদি কোন প্রয়োজন হয়, আমাকে খবর দিতে দ্বিধা করো না।

মিঃ পার্ডো বিদায় নিলে আমি তার কথাগুলো মনে মনে পুনরাবৃত্তি করতে লাগলাম।

গ্রেটা বলল, ভদ্রলোকের মতলবটা ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎ এখানে এসময় হাজির হয়েছেই বা কেন? বুঝতে পারছি না এরা নিজেদের জায়গায় ফিরে না গিয়ে এখানে এসে জড়ো হচ্ছে কেন?

—সেদিন জর্জ হোটেলে স্টানফোর্ড লয়েডকেই দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। দূর থেকে দেখা বলে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না।

—ক্লডিয়ার মতো দেখতে একটা মেয়েকেও তো তার সঙ্গে চোখে পড়েছিল বলে বলেছিলে। মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক গোপনে ক্লডিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

আর মিঃ পার্ডো এসেছিল কোরার সঙ্গে দেখা করতে—এখন সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। যোগাযোগগুলো খুবই অদ্ভুত।

—কিন্তু এই যোগাযোগের ব্যাপারটা খুব ভাল বোধ হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে সেদিন সকলেই এই অঞ্চলের আশপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

আমার নিজের উদ্বেগ হলেও গ্রেটা বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হল না। সহজ ভাবেই বলল, এমন ঘটনা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।

।। চার ।।

ইলিয়ার মরদেহ নিউইয়র্কে নিয়ে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। সমাধিক্ষেত্রে আমাকেও উপস্থিত থাকতে হবে।

এদিকে, জিপসি একরে আমার কোন কাজ ছিল না। তাই ভাবলাম এই সুযোগে ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলাও একসঙ্গে মিটিয়ে আসা যাবে। গ্রেটার ওপরে এদিককার দায়িত্ব দিয়ে আমি যথাসময়ে নিউইয়র্ক রওনা হলাম।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে গ্রেটা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, একটা কথা মনে রেখো ওখানে তোমার মিত্রপক্ষ কেউ নেই, সকলেই শত্রুপক্ষ। একেবারে হিংস্র জন্তুর মত দাঁত নখ বার করে অপেক্ষা করে রয়েছে।

সর্বদা নিজের সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সামান্য সুযোগ পেলেই কিন্তু তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

নিউইয়র্ক পৌঁছে বুঝতে পারলাম, গ্রেটা মোটেই ভুল আন্দাজ করেনি। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করতে পারলাম একেবারে জঙ্গলের রাজত্বে এসে পড়েছি।

আমি এখানে শিকার—শিকারীরা সকলে লোলুপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ করছে আর জিব দিয়ে থাবা চাটছে।

মিঃ লিপিনকট আমাকে এক আইনজীবীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। খনি সংক্রান্ত সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করবার পরামর্শানুসারে তার প্রয়োজনীয় দলিলপত্রগুলো ভদ্রলোককে দিয়ে দেখিয়ে নেবার দরকার হয়েছিল।

আইনজীবী ভদ্রলোক আমার পরামর্শদাতার নাম জানতে চাইলেন। আমি স্ট্যানফোর্ড লয়েডের নাম করলাম।

নামটা শুনেই গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, আমরা যে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করে কোন মতামত দেব না মিঃ লয়েডের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির তা জানা উচিত।

পরে তিনি জানিয়েছিলেন, দলিলের শর্ত যা আছে তাতে মালিকানার ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল নেই। এমন পরামর্শও তিনি দিলেন, খনিজসম্পদ বিশিষ্ট ওই জমি এখুনি হস্তান্তর করা অনুচিত। ধরে রাখলে পরে অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে।

এই ঘটনা থেকে আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে নিরীহ হরিণ শিশুরমতই শিকারের জন্য আমার চারদিকে সকলে ভিড় করে আছে।

সকলেই বুঝতে পেরে গেছে বিষয় সম্পত্তির লাভ লোকসানের হিসাব নিকেশের ব্যাপারে

আমি সম্পূর্ণ ভাবেই অজ্ঞ।

এদিকে শবানুগমনের অনুষ্ঠান বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই সম্পন্ন হল। নানা রঙের ফুলে স্তূপ জমে গেল সমাধিস্থলে।

এই প্রাণহীন আড়ম্বর কিছুই যে ইলিয়া পছন্দ করত না, আমি তা নিশ্চিত ভাবে জানি। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের মনস্তুষ্টির এ ব্যাপার আমাকেও মেনে নিতেই হল।

নিউইয়র্কে পৌঁছবার চারদিনের মাথায় কিংসটন বিশপ গ্রামের খবর এল মেজর ফিলপটের চিঠিতে। পুলিস অনেক অনুসন্ধানের পরে জঙ্গলাকীর্ণ এক পাহাড়ী খাদের মধ্যে থেকে বুড়ি লীর মৃতদেহ উদ্ধার করতে পেরেছে।

বুড়ি ওখানে বেশ কয়েক দিন ধরে মরে পড়েছিল। বুড়ি লীর ঘর অনুসন্ধান করে এক গোপন জায়গা থেকে তিনশোখানা পাউণ্ডের নোটও উদ্ধার হয়েছে।

চিঠির শেষে তিনি আরও একটা খবর জানিয়েছেন। লিখেছেন, তুমি দুঃখ পাবে জেনেও লিখতে হচ্ছে, গতকাল ক্লডিয়া হার্ডক্যাসল এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এক্ষেত্রে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েই দুঃখজনক দুর্ঘনাটা ঘটেছে।

দুসপ্তাহের মধ্যেই পরপর দুজনের একইভাবে আকস্মিক মৃত্যু ঘটল ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে। এমন সংবাদের পরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়—এসব কি নিতান্তই আকস্মিক, না অন্য কিছু ?

রাতারাতি আমি ফকির থেকে বাদশা বনে গেছি। এই কথাটা প্রতি মুহূর্তে আমার মনে পড়িয়ে দিয়েছে ইলিয়ার পরিবারের অসংখ্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন। সারাক্ষণই আমার মনে হতো এদের মধ্যে আমি কোন ভিনগ্রহের আগন্তুক। চলাফেরায় কথা বলায় একচুল অসতর্ক হবার উপায় নেই।

কতদিন ছিলাম, এখন আর মনে করতে পারি না। তবে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম যে তাতে সন্দেহ নেই।

যার সুবাদে আমার এখানে আসা—সেই ইলিয়া, একান্ত আমার ইলিয়া আর নেই। কিন্তু তার স্মৃতি এখনো তরতাজা রয়েছে জিপসি একরে। সেখানেই ছুটে যাবার জন্য প্রাণটা আইঢাই করতে লাগল।

কিন্তু যেতে চাইলেই কি আর যাওয়া যায়। আমি এখন আর কেবল সামান্য মাইকেল রজার নই। ইলিয়ার উইলের দৌলতে এখন আমি আমেরিকার অন্যতম ক্রোড়পতি। আমার টাকা অসংখ্য জায়গায় লগ্নি করা, নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে সেই বিশাল অর্থনৈতিক জগৎ। তার দায়দায়িত্বও কম নয়—অন্ততঃ খবরাখবর রাখাটুকুও।

যেদিন ইংলণ্ডে ফিরব তার আগের দিন মিঃ লিপিনকট এলেন। তাঁকে জানালাম স্ট্যানফোর্ড লয়েডকে আমার বিষয় সম্পত্তির লগ্নি সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাই।

কথাটা শুনে মিঃ লিপিনকটের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। মুখের রেখায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। উদ্বিগ্ন ভাবে জানতে চাইলাম, কাজটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে কি আপনি মনে করেন ?

—তুমি কি তার সম্পর্কে কোন কারণ খুঁজে পেয়েছ ?

বললাম, না। তেমন চেষ্টাও করিনি। আমার একরকম অনুভূতির বশেই মনে হয়েছে ভদ্রলোক সন্দেহের উর্ধ্বে নন।

—হুঁ। লিপিনকট এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। পরে বললেন, তোমার এই অনুভূতির প্রশংসা করতে হয়। তোমার অনুমান যে যথার্থ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরিষ্কারই হয়ে গেল, ইলিয়ার লগ্নি সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ট্যানফোর্ড লয়েড দীর্ঘদিন থেকেই যথেষ্ট কারচুপির কর্ম করে চলেছেন।

আমি আর কাল বিলম্ব না করে বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনার যাবতীয় দায়দায়িত্ব মিঃ

লিপিনকটের হাতে তুলে দিলাম।

মিঃ লিপিনকট আমাকে কথা দিলেন, ইলিয়ার সম্পত্তির স্বার্থরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করবেন।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সইসাবুদ হয়ে যাবার পর আমার এদিককার কাজকর্ম আপাততঃ সাঙ্গ হল। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিঃ লিপিনকট জানতে চাইলেন, তুমি কি প্লেনে ফিরছ?

—না। জাহাজেই যাচ্ছি। সমুদ্রযাত্রায় খানিকটা মনের সুস্থিরতা ফিরে পাব বলেই আমার বিশ্বাস।

—ফিরে গিয়ে কোথায় উঠছ?

—কেন, জিপসি একরে।

—তাহলে ওখানেই থেকে যাবে সিদ্ধান্ত করেছ?

—হ্যাঁ। জিপসি একর ছেড়ে আমি কোন দিনই যেতে পারব না। তাছাড়া ওখানে গ্রেটা রয়েছে, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ইলিয়ার জন্য যথেষ্ট করেছে।

—হ্যাঁ, সেকথা তুমি বলতে পার।

—গ্রেটা সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা ভেঙ্গেছে। বাইরে থেকে দেখে তাকে ঠিক বোঝা যায় না। ইলিয়ার মৃত্যুর পর ও যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে বাইরের কারুরই ধারণা করা সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছেন, সঙ্গতভাবেই তার প্রতি আমার একটা কর্তব্যও বর্তেছে।

—মেয়েটি যে কর্মনিপুণা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিদায় নেবার আগে মিঃ লিপিনকট শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, জিপসি একরের ঠিকানায় তোমার নামে ছোট্ট একটা চিঠি পাঠিয়েছি। এয়ার মেলে যাবে—তোমার পৌঁছবার আগেই চিঠি পৌঁছে যাবে। ...তোমার সমুদ্রযাত্রা শুভ হোক।

।। পাঁচ ।।

সুদীর্ঘ সংগ্রামের অবসান হয়েছে। এবার আমি আমার নিজের ঘরে ফিরে চলেছি। সমুদ্র যাত্রার অবসান হলেই আমি আমার প্রার্থিত সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হব। আর কোন বাধাবন্ধ নেই।

জাহাজে বিলাসবহুল কেবিনে শুয়ে শুয়ে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারের দিকে চোখ মেলে কেবল ভেবেছি, আমার অন্তহীন চাওয়ার এতদিনে অবসান হল। ছেলেবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছি এতদিনে তা সার্থক হল।

ইলিয়ার মুখও বারবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। সে যেন অন্য এক জন্মের কাহিনী। জিপসি একরে তার সঙ্গে প্রথম দেখা। রিজেন্ট পার্কের নিভৃত কোণে দেখা সাক্ষাৎ, রেজিস্ট্রারের অফিসে অনাড়ম্বর বিবাহ অনুষ্ঠান, তারপর জিপসি একরে স্থাপত্য কৌশলের নব নিদর্শন নয়নাভিরাম প্রাসাদ নির্মাণ—সবই যেন অতি দ্রুত ঘটে গেল।

কিন্তু ওই প্রাসাদ—ওটা সৃষ্টি হয়েছে একান্ত ভাবেই আমার জন্য। এখন এই প্রাসাদপুরীর মালিক আমি। যা হতে চেয়েছিলাম তাই হয়েছি—সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরে।

নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা করার আগে মেজর ফিলপটকে আমার যাত্রার সংবাদ জানিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এয়ার মেলে। আমার পৌঁছবার আগেই তিনি চিঠি মারফত আমার সবকথা জেনে যাবেন।

একমাত্র মেজরকেই আমার অবস্থাটা বোঝানো সহজ বলে মনে হয়েছে। একদিন সকলেই জানতে পারবে, কিন্তু সহজভাবে নিতে পারবে না। কিন্তু মেজর সকলের মত নন, তিনি খুব কাছে থেকে ইলিয়া ও গ্রেটাকে দেখেছেন। সবই জানেন, আমার বিশ্বাস তিনি সহজভাবেই মেনে নিতে পারবেন।

মেজর বিজ্ঞ ব্যক্তি। গ্রেটার ওপরে ইলিয়ার নির্ভরশীলতার বিষয়টি তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এখন ওই ইলিয়া বিহীন প্রাসাদপুরীতে একা আমাকে জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু তা যে কতটা দুরূহ নিশ্চয় তিনি অনুভব করতে পারবেন।

ইলিয়ার বদলে একজন কেউ না হলে, আমাকে সাহায্য করবার কেউ না থাকলে, আমি একা বাঁচব কি করে।

আমার একান্ত বক্তব্য যথাসাধ্য বুঝিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি মেজর ফিলপটকে। আমার বিশ্বাস আমি গুছিয়ে লিখতে পেরেছি।

আমার চিঠির কথাগুলো ছিল এরকম—

আমাদের প্রতি আপনার সহৃদয়তার কথা স্মরণে রেখেই কথাটা আপনাকেই প্রথম জানাবার প্রেরণা পেয়েছি। আমার সমস্যাটা একমাত্র আপনিই ভাল করে বুঝতে পারবেন। আমেরিকায় যে কটা দিন কাটিয়েছি, প্রতি মুহূর্তে একটা চিন্তাই ঘুরে ফিরে আমার মনে উদয় হয়েছে, একা একা জিপসি একরে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি করে?

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করেছি, ফিরে গিয়ে গ্রেটার কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখব। ইলিয়ার কথা গ্রেটার কাছে ছাড়া আর কাউকে প্রাণ খুলে বলা সম্ভব নয়। গ্রেটা আমাকে বুঝতে পারবে।

আমার বিশ্বাস গ্রেটা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে না। যদি এই বিয়েটা সম্ভব হয়, তাহলে মনে করতে পারব, বরাবরের মত আমরা তিনজনই একসঙ্গে রয়েছি।...

এয়ার মেলের চিঠি নিশ্চয় মেজর আমার পৌঁছবার দিন কয়েক আগেই পেয়ে যাবেন।

আজ আমি একজন সার্থক মানুষ। আমার সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত কর্মকুশলতা, যা আমি চেয়েছিলাম, সবই আজ বাস্তবে রূপ পেয়েছে। এখন আমি বিজয়ী পুরুষ। বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ করে ফিরে চলেছি আমার গৃহে।

দুটো আকাঙ্ক্ষাই আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। সেই দুটোই আজ আমার করায়ত্ত।

চেয়ে নিজের জন্য মনের মতো একটা প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের কল্পনা বিলাস জীবনের অঙ্গ হয়ে ল। আর চেয়েছিলাম আশ্চর্য সুন্দর এক নারী—মনে প্রাণে একান্তভাবেই সে হবে আমার

মনে মনে বিশ্বাস করতাম, দুনিয়ার কোথাও না কোথাও সেই নারী আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে, কোন না কোনদিন তার সাক্ষাৎ আমি পাব।

তা স্বপ্নের সেই সঙ্গিনীর সন্ধান একদিন পেয়ে গেলাম। দেখা মাত্রই আমরা অচ্ছেদ্য হৃদয়-বন্ধনে আবদ্ধ হলাম—পরস্পরকে আপন করে নিলাম।

আজ সেই প্রণয়িনীর কাছেই ফিরে চলেছি আমি। জাহাজ থেকে নামার পর থেকে তারই ধ্যানে বিভোর হয়ে আছি।

সন্ধ্যার মুখে মুখে ট্রেন থেকে নামলাম। তারপর অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ ধরে হেঁটেই রওনা হলাম বাড়ির দিকে।

আমার আসার খবর জানিয়ে গ্রেটাকে আগেই একটা তার করে দিয়েছিলাম। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি স্বপ্নের প্রাসাদপুরীতে গ্রেটা সেজেগুজে আমারই অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে।

যেই দিনটির জন্য এতদিন আমরা উভয়ে প্রতীক্ষায় দিন গুনেছি, সেই বহুবাঞ্ছিত দিনটি আজ। এই দিনটির জন্য কী কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হয়েছে আমাদের। নিপুণ অভিনেতার মত অভিনয় করতে হয়েছে আমাদের দুজনকেই। এখন আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে আমার অদ্ভুত ভূমিকার কথা মনে করে। গ্রেটার প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব যে কপট, ঘুণাক্ষরেও তা কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। সবাই জেনেছে গ্রেটাকে আমি সহ্য করতে পারি না, মনে মনে দারুণ ঘৃণা করি।

আমার আর ইলিয়ার মাঝখানে গ্রেটার উপস্থিতিও যে কোনভাবেই আমার অভিপ্রেত নয় ইলিয়াকেও সেকথা নিপুণভাবে বোঝাতে পেরেছি।

আমার মনে যে গ্রেটার প্রতি দুরন্ত ঘৃণা চাপা রয়েছে তা বোঝবার জন্য ইলিয়ার সামনে সেদিন কপট ঝগড়াও বাধিয়েছিলাম।

গ্রেটার মানসিক গঠনও ছিল আমারই মত। তাই প্রথম দর্শনেই সে আমাকে চিনে নিতে ভুল করেনি। আমারই মত তারও বুক জুড়ে ছিল পৃথিবীটাকে ভোগ করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

দুজনের চাওয়া একদিন এক হয়ে গেল। হামবুর্গে প্রথম দর্শনের দিনেই আমি তাকে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অকপটে খুলে বলেছিলাম। গ্রেটাও তার কামনা-বাসনা আমার কাছে গোপন করেনি।

তারপর সেই মনে করিয়ে দিয়েছিল, মনোবাসনাকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই অর্থ —অপর্যাপ্ত অর্থ।

অর্থের পেছনেই ছুটে চলেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। স্কুল ছাড়বার পরদিন থেকেই। বছরের পর বছর অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছি—কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সম্ভাবনা দেখতে পাইনি। এভাবেই হয়তো জীবন উপভোগের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন চলে যেত—জাগতিক কামনা-বাসনা পূরণের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত যদি গ্রেটার সঙ্গে দেখা না হত।

গ্রেটা আমাকে আশস্ত করে বলেছিল, ইচ্ছানুরূপ অর্থ লাভ করার উপায় তোমার হাতেই আছে। মেয়েদের মন কাড়ার মত সম্পদ যার থাকে তার কি অর্থের অভাব হতে পারে? তুমি দেখছি নিজেকেই নিজে চেন না।

—মেয়েদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? তারপর গ্রেটাকে দুহাতে বুকে টেনে নিয়ে বলেছি, পৃথিবীতে একটি নারীই কেবল আমার কাম্য—আর সে হচ্ছে তুমি। আমি একান্তভাবেই তোমার—কেবল তোমারই।

আমি জানতাম দুনিয়ার কোথাও না কোথাও আমার স্বপ্নের নায়িকা অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য—তোমাকে আমি ঠিক চিনে নিতে পেরেছি।

গ্রেটা বলেছে, কী আশ্চর্য, তোমাকে দেখার পর আমারও একই কথা মনে হয়েছে।

স্বপ্ন সফল করার সহজ পথ গ্রেটা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, অঢেল বিষয় সম্পত্তি রয়েছে এমন কোন ধনী মহিলাকে বিয়ে করতে হবে।

—তেমন বিত্তবান মেয়ে পাব কোথায় আমি?

গ্রেটা হেসে বলেছিল, যদি চাও, তেমন একজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

—কিন্তু তাতে কতটা লাভ হবে। ধনবতী মহিলাদের স্বামী হওয়াটা কিছু মাত্র সুখের বলে মনে হয় না আমার। সারাজীবন পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটানো সহ্য হবে না আমার।

—বরাবর থাকতে যাবে কেন? মতলব হাসিল করতে হলে কিছুদিনের জন্যে তো থাকতেই হবে। স্ত্রী তো একদিন মারা যেতে পারে—কেউ তো আর চিরজীবী হয়ে পৃথিবীতে জন্মায় না।

এতটা আমি ভাবতে পারিনি। স্তম্ভিত হয়ে গ্রেটার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে গ্রেটা বলল, কথাটা শুনে তুমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লে মনে হচ্ছে—

—বিচলিত ঠিক না, তবে—

—আমি জানতাম তুমি বিচলিত হবে না। এবং অবিচলিত থেকেই তোমাকে কাজ করে যেতে হবে। একজন আমেরিকান ক্রোড়পতি যুবতীর দেখা শোনা আমি করি। তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তার ওপর আমার কিছুটা প্রভাব রয়েছে।

—বড় বড় ধনীর দুলাল থাকতে আমাকে সে পছন্দ করতে যাবে কেন? তাকে বিয়ে করার যোগ্যতাও সেই সব ধনী-পুত্রদের আমার চাইতে অনেক বেশি।

—তা ঠিক। তবে তোমার মধ্যে যা আছে তা অনেক পুরুষের মধ্যেই থাকে না। তোমাকে দেখে মেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হবে। একজন মেয়ে হিসেবে আমার তাই ধারণা।

গ্রেটার মুখের স্তুতি শুনে আমি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলাম।

—তাছাড়া, সেই মেয়ে অন্য দশটা মেয়ের মত নয়। সারাক্ষণ তাকে অদ্ভুত এক গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়।

বিশেষভাবে বাছাই করে ধনকুবের যুবকদের সঙ্গেই কেবল তাকে মিশতে দেওয়া হয়। তোমার মত পুরুষ দেখার সুযোগ সে কোনদিন পায়নি।

তার প্রকৃতি কিছুটা অন্যরকম। আড়ম্বরপূর্ণ কৃত্রিম জীবন সে একদম বরদাস্ত করতে পারে না। সে চায় স্বাভাবিকভাবে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে, পরিচিত গণ্ডীর বাইরের জগৎটাকে জানতে।

তোমাকে যা করতে হবে তা হলো নিপুণ প্রেমের অভিনয়। তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে প্রথম দর্শনেই তুমি তার প্রেমে ডুবেছ।

তোমার এই অভিনয়ই তাকে আকৃষ্ট করবে—সে বাইরের জগতের মুক্ত হাওয়ার স্বাদ নিতে চাইবে। এর ফলে গণ্ডীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত মেয়েটি তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। কেন না, ইতিপূর্বে কোন পুরুষের কাছ থেকে সে ঘনিষ্ঠ প্রেমের আহ্বান পায়নি। তুমিই হবে তার জীবনের প্রথম পুরুষ। ...কি পারবে না?

গ্রেটার তুলনা হয় না। নিখুঁত পরিকল্পনাটি সে আমার মাথায় নিপুণভাবে ঢুকিয়ে দিল। আমি দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললাম, একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন কি ব্যাপারটা মেনে নেবে?

গ্রেটা দৃঢ়কণ্ঠে জানাল, তেমন সুযোগই তারা পাবে না। বিয়ের আগে পর্যন্ত তাদের এব্যাপারে কোনকিছুই জানতে দেওয়া হবে না। বিয়েটা সারতে হবে গোপনে—তারপর সকলে জানতে পারবে।

এরপর পরিকল্পনাটা নিয়ে দুজনে অনেক সময় ধরে আলোচনা করলাম। তারপর কিভাবে এগুতে হবে সেই সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললাম।

গ্রেটা ছুটিতে এসেছিল। সে আবার যথাসময়ে আমেরিকা ফিরে গেল। তবে চিঠিপত্রে আমার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখল।

ইতিমধ্যে আমিও ফিরে গেলাম আমার জীবনে—রুজিরোজগারের ধান্দায়।

একসময় ঘুরতে ঘুরতে জিপসি একরে উপস্থিত হয়েছিলাম। জায়গাটা খুবই পছন্দ হয়ে গেল। গ্রেটাকে চিঠিতে সে কথা জানালাম।

এরপর সব ঘটনাই ঘটে চলল ছক বাঁধা পথ ধরে। পরিকল্পনা মতই জিপসি একরেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল ইলিয়ার সঙ্গে।

গ্রেটা তার আগেই ইলিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিল, কিভাবে সে আত্মীয়স্বজনের কঠিন অনুশাসনের বাইরে গিয়ে স্বাধীন জীবন উপভোগ করতে পারে।

সেই পরামর্শ মতই ইলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার একুশ বছর বয়স হলে, ইংলণ্ডে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

নিখুঁতভাবে পরিকল্পনাটা ছকে ছিল গ্রেটা। এবিষয়ে তার মাথা যে খুব ভাল খেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত খুঁটিনাটি বজায় রেখে এমন একটা পরিপাটি ফন্দি কখনোই আমার মাথায় খেলত না।

তবে নিজের ভূমিকাটুকু নিয়ে আমার কোন উদ্বেগ ছিল না। বিশ্বাস ছিল, সুষ্ঠুভাবেই তা সম্পন্ন করতে পারব।

আমাদের পরিকল্পিত পথেই ইলিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা থেকে পরবর্তী ঘটনাবলী এগিয়ে চলল।

আশপাশের কারোর মনে যাতে আমার ও গ্রেটার সম্পর্কে কোন সন্দেহ উঁকি দিতে না পারে সেজন্য আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম, আগাগোড়া আমরা পরস্পরের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব বজায় রেখে চলব।

রঙ্গমঞ্চে গোটা পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করা খুবই ঝুঁকির কাজ ছিল। কিন্তু আমাদের দুজনের নিপুণ অভিনয় গোটা ব্যাপারটাকে নির্বিঘ্নে উৎরে দিয়েছিল।

ইলিয়া এমনই নরম স্বভাবের মিষ্টি মেয়ে ছিল যে তার সঙ্গে প্রেম করা ছিল খুবই সহজ ব্যাপার। অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল।...বলতে বাধা নেই...মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়, আমিও হয়তো ওকে ভালবাসতাম। তার সঙ্গ আমার খুবই ভাল লাগত।

তবে গ্রেটা ছিল আমার হৃদয়েশ্বরী। তার পাশে আমি অপর কাউকেই ভাবতে পারি না।

সে ছিল আমার সকল কামনা-বাসনার শরীরী প্রতিমূর্তি।

আমি আজ সর্ব অর্থেই একজন সফল পুরুষ। মনের মত নারী, মনের মত বাড়ি এবং অগাধ বিত্ত-সম্পদ আমার করায়ত্ত। ইলিয়ার এক উইলের দৌলতে আমি এখন আমেরিকার ক্রোড়পতিদের একজন।

এই সবকিছু এসেছে খুব সোজা পথে নয়। কেবল ছল-চাতুরী নয়, খুনও আমাকে করতে হয়েছে, তবে আজ আমি সাফল্যের চূড়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি।

আমেরিকা থেকে ফিরে সেদিন সন্ধ্যায় এমনি অনেক কথাই আমার মনে উদয় হয়েছিল। সবচেয়ে স্বস্তির বিষয় এটাই ছিল আমাদের দুজনের, গ্রেটার এবং আমার সত্যিকার পরিচয় বা উদ্দেশ্য বাইরের কেউ বিন্দুমাত্রও আঁচ করতে পারেনি। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করাবার মত কোন প্রমাণ কেউ কখনো খুঁজে পাবে না।

এতদিন কিছুটা উদ্বেগ আশঙ্কা যদিও বা মনে ছিল, আজ আর তার লেশমাত্র নেই। বিপদের সব রকম সম্ভাবনাই আজ মুছে গেছে।

এখন আমি আমার চির আকাঙ্ক্ষিত নারীকে বিবাহ করে নিঃশঙ্ক মনে স্বপ্নপুরীর অধিপতি হয়ে ভোগ-বিলাসের জীবনে ভেসে পড়ব। আমাদের জয় নিঃশেষে উপভোগ করব।

বাড়ির গেটের সামনে আলো জ্বলছিল। সদরে চাবি ছিল না। জুতোর শব্দে বেশ জানান দিয়েই ভেতরে ঢুকলাম।

লাইব্রেরীঘর পার হয়ে দেখতে পেলাম পাশের ঘরে জানালার ধারে পরী সেজে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেটা। আমার জন্যই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তার সেই আগুনজ্বলা রূপ বুকের ভেতরে ঝড় তুলল।

কতদিন তার নীল পদ্মের মত আয়ত চোখে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারিনি, পেলব দেহবল্লরীর সুবিন্যস্ত ভাঁজ, চড়াই-উৎরাই পেষণসুখে আমাকে আবিষ্ট করেনি।

উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে গ্রেটাকে জড়িয়ে ধরলাম। একটা ঝড় যেন দুজনকে উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলল খাটের ওপরে।

অনেকক্ষণ পরে দুজনে শান্ত হলাম। পরিতৃপ্তির আবেশ কেটে গেলে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। গ্রেটা কিছু চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিল। মিঃ লিপিনকটের খামটাই আগে বেছে নিলাম।

ভদ্রলোক আমার উপস্থিতিতেই চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন। কি এমন কথা থাকতে পারে যা তিনি মুখে না জানিয়ে চিঠিতে লিখতে বাধ্য হলেন?

গ্রেটা বলল, আমরা আজ বিজয়ী—সার্থক। বাইরের কোন প্রাণীই কিছু জানতে পারেনি।

দুজনেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠলাম। দুজনেই চুম্বন বিনিময় করলাম।

গ্রেটা জানতে চাইল, মাইক এই বাড়িতেই কি আমরা বরাবর বাস করব?

—অবশ্যই। সারাজীবন যেই বাড়ির স্বপ্ন দেখেছি, সেখানে বাস করবারই তো ইচ্ছে আমার। কেন, তুমি কি বলছ?

—আমার ইচ্ছে, এখন তো ইচ্ছে মত খরচ করবার মত অর্থের অভাব নেই আমার, পৃথিবীটা মনের সুখে ঘুরে দেখব। খুশিমতো কেনাকাটা করব। পাহাড় জঙ্গল মরুভূমি কোথাও বাদ দেব না—

—তবে সবসময়েই আবার এখানেই ফিরে আসব।

গ্রেটা মাথা নেড়ে সায় জানাল। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুকের মধ্যে যেন একটা অস্বস্তি মোচড় দিয়ে উঠল।

এই রাজকীয় প্রাসাদ, অগাধ বিত্ত—তাতেও সন্তুষ্ট নয় গ্রেটা! আরও কিছু পেতে চায় সে। কিন্তু...কিন্তু তার চাওয়ার কি এখানেই নিবৃত্তি হবে? কিন্তু মানুষের চাওয়ার তো শেষ হয় না—গ্রেটার চাওয়াও যে দিন দিন বেড়ে চলবে।

প্রচণ্ড ক্রোধে মাথার ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। তীব্র আক্রোশে হাত পা কাঁপতে শুরু করল। জোর করে মনটাকে অন্যদিকে নেবার চেষ্টা করলাম। এমন কেন হল হঠাৎ?

লিপিনকটের চিঠিটা টেনে নিলাম। খামের ভেতর থেকে বেরুলো পুরনো খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া একটা ছবি।

ছবিটা কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না—হামবুর্গের একটা কর্মব্যস্ত পথের দৃশ্য। ক্যামেরাম্যানের সামনেই ছিল কয়েকজন নরনারী। মুখোমুখি এগিয়ে আসছে তারা। প্রথম দুজনকে আমার চিনতে কষ্ট হল না।

পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে হাসিখুশি ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। দুই তরুণ তরুণী। তাদের একজন গ্রেটা, দ্বিতীয় জন স্বয়ং আমি।

সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে নিথর হয়ে গেল। মিঃ লিপিনকট তাহলে আমাদের চিনতে পেরেছেন!

গ্রেটা আর আমি দুজনেই যে পূর্বপরিচিত এ তথ্যও তার অজানা ছিল না?

কেউ নিশ্চয় গ্রেটাকে আগে চিনতে পেরেছিল এবং লিপিনকটকে কাগজের কাটিংটা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

হয়তো এর পেছনে কোন অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু ছবিটা হাতে পেয়েই লিপিনকট আমাদের দুজনকে গোড়া থেকেই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

মনে পড়ল, অনেকবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে তিনি জানতে চেয়েছিলেন গ্রেটার সঙ্গে আমার আগে কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে কিনা। আমি বরাবরই অস্বীকার করে গেছি।

এখন বুঝতে পারছি, আমার কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল, তা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর তখন থেকেই তাঁর সন্দেহের দৃষ্টি আমার ওপরে ছিল।

প্রচণ্ড একটা ভয় আমাকে ক্রমশ কুঁকড়ে ফেলছিল। হাত-পা শিথিল হয়ে আসতে লাগল। ইলিয়াকে যে আমিই সুকৌশলে খুন করেছি—এমন সন্দেহ না করলেও এধরনেরই কিছু একটা আঁচকরা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। পাকা বুদ্ধির ঝানু মাথা তার।

গ্রেটাও ঝুঁকে ছবিটা দেখল। তাঁরও মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, গ্রেটা, বুঝতেই পারছ, আমরা যে পরস্পরের পরিচিত এবং বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই যে নিজেদের পরিচয়ের কথা গোপন করে আমাদের ইলিয়ার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলাম, প্রথম দিন থেকেই ওই ধূর্ত শেয়ালটা জানতে পেরেছিল।...কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেনি। আমি যদি এখন তোমাকে বিয়ে করি, তাহলে তা আর তার কাছে অস্পষ্ট থাকবে না।

গ্রেটা বলল, মাইক, তুমি একটা ভীরু খরগোশের মত হয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার সাহসের জন্যই আমি তোমাকে পছন্দ করি। কিন্তু এখন তুমি নিজের ছায়া দেখেই যেন ভয় পাচ্ছ।

আমি বিড়বিড় করে বললাম—এসব কথার আর সময় নেই গ্রেটা। সামনে অসীম অন্ধকার। রাত—অন্তহীন গভীর কাল রাত—

—পাগলের মত বকবক করবে না। তুমি কি কাপুরুষ হয়ে পড়ছ—ভয়ে ভেঙ্গে পড়ছ—

—গ্রেটা, অভিশপ্ত জিপসি একরের অভিশাপ থেকে আমরাও মুক্ত থাকতে পারিনি। সত্যিই এজায়গাটা অভিশপ্ত।

—এসব কুসংস্কার তুমি বিশ্বাস কর মাইক?

আমার ভেতরে কিছুক্ষণ আগের দুরন্ত ক্রোধটা আবার জেগে উঠল। একটা বিদ্বেষ--জিঘাংসা।

প্রচণ্ড ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে তাকালাম গ্রেটার মুখের দিকে। আর ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভব হল না। কেউ যেন আমাকে জোর করে টেনে তুলল চেয়ার থেকে। ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরলাম গ্রেটাকে। দু হাতে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরলাম সজোরে...

তারপর...তারপর...

banglabooksz.blogspot.com

☆ ☆ ☆